৮.১৫ লৌহমানব ও বনহুর – Bangla Library

৮.১৫ লৌহমানব ও বনহুর – Bangla Library

লৌহমানব ও বনহুর –১৩৫

চমকে ফিরে তাকালো বনহুর, তাকিয়েই হতভম্ব হয়ে গেলোতার দুপাশে দুটি লোক দাঁড়িয়ে আছে। তাদের দেহে অদ্ভুত ধরনের পোশাক। বনহুর উঠে দাঁড়াতেই লোক দুজন তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলো। চারটি হাত তাকে যেন গ্রাস করতে এগিয়ে আসছে।

বনহুর দ্রুত সরে দাঁড়ালো।

লোক দুটি তাকে ধরবার জন্য সরে এলো তার কাছে।

বনহুর এবার পেছন দিকে হটতে লাগলো। সে প্রথম দৃষ্টিতেই বুঝতে পেরেছে লোক দুটি রক্তে-মাংসে গড়া মানুষ নয়-যন্ত্রমানব।

কদিন হলো মানদ্বীপ নগরে এসেছে সে একটি অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির আমন্ত্রণপত্র পেয়ে। বনহুর পত্রখানা পাঠ করেই বুঝতে পেরেছিলো পত্রলেখক মিত্র নয়–শত্রু। তবুও সে ঐদিন রাতেই মানদ্বীপ নগরের উদ্দেশে যাত্রা করেছে কাউকে না জানিয়ে। ঐ চিঠিখানা সম্বন্ধেও কেউ জানে না, চিঠিখানা পেয়েছিলো বনহুর তাজের গলায় বাধা একটি সুতার সঙ্গে। গাঢ় নীল রঙের সুতার সঙ্গে গাঁথা ছিলো চিঠিখানা। বনহুর যখন তাজকে আদর করছিলো তার শরীরে হাত বুলিয়ে, ঠিক ঐ সময় তাজের গলায় তার দৃষ্টি পড়ে। অবাক হয় বনহুর, তাজের গলায় সুতা বাঁধলো কে? শুধু সুতাই নয়, তার সঙ্গে একটি চিঠি ভাজ করে বাঁধা আছে।

বনহুর বুঝতে পারলো তার আস্তানায় কেউ প্রবেশ করেছিলো। শুধু আস্তানায় প্রবেশই করেনি, তাজের কাছে এসেছিলো, এবং দুঃসাহস নিয়ে তাজের দেহও স্পর্শ করেছিলো। ভীষণ দুঃসাহসী ব্যক্তিটি। শুধু সে দুঃসাহসীই নয়, অত্যন্ত বুদ্ধিমানও বটে।

বনহুর তাজের কণ্ঠ থেকে নীল সুতাটা খুলে নিয়ে ভাজকরা কাগজটা খুলে পাঠ করলো……

বনহুর, তোমার বুদ্ধিমত্তা আর অসীম শক্তির প্রশংসা করি। এবার তোমার বুদ্ধি ও শক্তি পরীক্ষার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। যদি ভীত হও তবে এসো না, আর যদি ভয় না পাও তবে চলে এসো। তোমার অপেক্ষায় আছি।

—লৌহমানব, মানদ্বীপ নগর

হাঃ হাঃ হাঃ করে হেসে উঠলো বনহুর। আপন মনেই বললো সে, তুমি যত বাহাদুরই হও লৌহমানব, আমাকে তুমি চেনো না। তুমি মানদ্বীপের আতংক, হাজার হাজার মানুষকে তুমি হত্যা করেছো। তোমাকে আমি না চিনলেও তোমার কাহিনী আমার অজ্ঞাত নয়। হাঁ, ঠিক সময়েই তুমি আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছো। মানদ্বীপের হাজারো মানুষের অশরীরী আত্মার দীর্ঘশ্বাস তোমাকে ক্ষমা করবে না। তবে তুমি কিছুটা বিস্ময়কর বটে–এতোদূর তুমি আসতে পেরেছো, আমার আস্তানায় প্রবেশে সক্ষম তাজের গলায় চিঠি লটকাতে পেরেছো তুমি কম নও!

ঐ দিনই বনহুর মানদ্বীপের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিয়েছিলো। সে মানদ্বীপে পৌঁছে বিমান বন্দরের বাইরে বেরিয়ে আসতেই এক বৃদ্ধ তাকে সাদর সম্ভাষণ জানালো, বললো–মিঃ চৌধুরী আসুন, আমি আপনাকে নিতে এসেছি। বিমান বন্দরের বাইরে গাড়ি অপেক্ষা করছে।

বনহুর নিজ ব্যাগটার দিকে একবার তাকালো, তারপর বললো—আপনি বুঝি……

হাঁ, তারই লোক।

চলুন।

বনহুর বাইরে বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে তার নজরে পড়লো পার্ক করা অনেক গাড়ির ভিড়ে একটি কালো রঙের গাড়ি। গাড়ি খানার চারপাশে সরু লাল রঙের বেষ্টনী রেখা। গাড়ির পাশে এসে পেছনের দরজা খুলে ধরে বললো বৃদ্ধ ভদ্রলোক —উঠুন।

বনহুর নীরবে গাড়িতে উঠে বসলো।

বৃদ্ধ এসে বসলো ড্রাইভিং আসনে। গাড়িতে স্টার্ট দিতেই গাড়ি ছুটে চললো উল্কা বেগে। উন্মুক্ত প্রশস্ত পথ, মাঝে মাঝে দু'একটা যানবাহন ঐ পথে চলে যাচ্ছে এদিক থেকে সেদিকে। বনহুর নীরবে তাকিয়ে আছে বাইরের দিকে।

বেশি কিছুক্ষণ গাড়িখানা ছুটে চললো অত্যন্ত দ্রুত গতিতে, তারপর তার গতি কিছুটা মন্থর হয়ে এলো। মস্ত বড় একটা হোটেলের সামনে এসে গাড়িখানা থামলো।

বললো বৃদ্ধ—এটা হোটেল মান্দার, এই নগরের সবচেয়ে বড় হোটেল। আপনার কোনোই অসুবিধা হবে না।

ধন্যবাদ! বনহুর ড্রাইভার-বেশী বৃদ্ধ ভদ্রলোকটার দিকে তাকিয়ে হোটেলের দিকে পা বাড়ালো।

কিছুটা এগুতেই একজন মানদ্বীপনগরবাসী বনহুরকে অভিবাদন জানিয়ে এগিয়ে নিলো-আসুন স্যার!

সামনে সিঁড়ির প্রশস্ত ধাপ। সিঁড়িগুলো মার্বেল পাথরে তৈরি। একটি জিনিস লক্ষ্য করে বনহুর অবাক হলো, হোটেলের বৃহৎ দেয়াল কালো মার্বেল পাথরে তৈরি। সিঁড়ির ধাপ বেয়ে হোটেলে প্রবেশ করলো বনহুর। সে জানে এক মৃত্যুগঘরে প্রবেশ করতে যাচ্ছে-বিপদ তাকে হাতছানি দিচ্ছে, জেনেশুনে সে বিষপাত্র তুলে নিয়েছে হাতে। এখন সেই পাত্র ত্যাগ করার কোনো উপায় নেই। তাকে গলাধঃকরণ করতেই হবে…

যে কক্ষটা বনহুরকে দেখিয়ে তার হাতে কক্ষের চাবি তুলে দেওয়া হলো, সে কক্ষটা অতি মনোরম। বহু হোটেলকক্ষে বনহুর উঠেছে কিন্তু এমন ধরনের সুন্দর পরিচ্ছন্ন মনোরম কক্ষ ইতিপূর্বে কমই দেখেছে।

বৃদ্ধ ড্রাইভার বনহুরকে তার নির্দিষ্ট কক্ষে পৌঁছে দিয়ে বললো—আপনার কোনো অসুবিধা হবে না…এ বোম দেখছেন-টিপলেই যা চাইবেন তাই পাবেন।

বনহুর শুধু একবার বোতামগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখলো। তারপর বৃদ্ধের মুখে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো।

ততক্ষণে বৃদ্ধ বেরিয়ে যাবার জন্য ফিরে দাঁড়িয়েছে।

বনহুরের দৃষ্টি ফিরে আসে কক্ষের মধ্যে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই নাস্তা, চা হাজির হয় তার টেবিলে। বয় সেগুলো টেবিলে সাজিয়ে রেখে বেরিয়ে যায়।

বনহুর তাকিয়ে দেখলো বয়টির শরীরে জমকালো পোশাক। মাথায় ক্যাপ, চোখ দুটি স্বচ্ছ কাঁচের টুকরোর মত কিছুটা নীল। বয় যখন ট্রে থেকে নাস্তার প্লেট আর চায়ের কাপ নামিয়ে রাখছিলো তখন বনহুর কিছুক্ষণ পলকহীন চোখে তাকিয়ে দেখলো ওকে।

বয় বেরিয়ে যাবার সময় ইংগিতে চা-নাস্তা খেতে বলে গেলো।

বুঝতে পারলো বনহুর—-বয়টি বোবা।

সমস্ত দিন কেটে গেলো।

বনহুর সেদিন হোটেল থেকে বের হলো না। কতকটা ইচ্ছে করেই বেরুলো না সে।

রাতের খাবারটাও বয় দিয়ে গেলো তার কামরায়।

ট্রেসহ খাবার রেখে চলে গেলো বয়।

বনহুর সমস্ত দিন বিশ্রাম করে কাটিয়েছে।

হোটেল মান্দান–গোটাটা ঘুরে দেখার ইচ্ছা হচ্ছিলো–কিন্তু মনোভাব দমন করে পরবর্তী অবস্থার জন্য প্রস্তুত ছিলো। সেই চিঠির কথা অনুযায়ী বনহুর এসেছে মানদ্বীপে। বনহুর জানে, স্বেচ্ছায় সে হিংস্র বাঘের গুহায় প্রবেশ করেছে, অবশ্য তার কারণ আছে। মানদ্বীপের হত্যাকান্ডের কথা বনহুরের অজানা ছিলো না। শত শত নিরীহ মানুষকে কে বা কারা প্রতিদিন হত্যা করে রাস্তার পাশে ফেলে রাখে। মৃতদেহের বুকে ছোট্ট একটা কাগজ গাঁথা থাকে, তাতে লেখা থাকে একটি শব্দ। —লৌহমানব

এ সংবাদ শোনার পর ভেবেছে বনহুর কে এই লৌহমানব। তাকে খুঁজে বের করতেই হবে। মানদ্বীপ নগরের পুলিশ বাহিনী এবং গোয়েন্দা বিভাগ হিমশিম খেয়ে গেছে। অনেক চেষ্টা করেও এই খুনীকে খুঁজে বের করতে পারেনি তারা।

বনহুর যখন লৌহমানবের চিঠি পেলো, তখন সকলের অজ্ঞাতে চলে এলো মানদ্বীপে। অবশ্য এর আগে বনহুর মানদ্বীপে আসেনি কোনো সময়। মানদ্বীপে বিমান বন্দরে অবতরণ করতেই নতুন একটা আস্বাদ গ্রহণ করেছিলো বনহুর–যেন না চাইতেই বৃষ্টিপাত। বৃদ্ধ ড্রাইভারের স্বাগত অভিনন্দন তাকে বিমুগ্ধ করেছিলো ক্ষণিকের জন্য।

হোটেল মান্নান আরও বিস্ময়।

এতবড় হোটেলে লোকজন তেমন নজরে পড়লো না। সে নীরবে বৃদ্ধকে অনুসরণ করে এসেছে এ হোটেলে।

সমস্ত দিনটা সুস্থভাবেই কেটে গেলো বনহুরের।

*

তখন রাত গভীর, খাবার প্লেটের নিচে একটা কাগজের টুকরা নজরে পড়লো বনহুরের। এত রাতেও বনহুর ঘুমায়নি, জেগেছিলো সন্তর্পণে। জানে সে, যে হোটেলে শুয়ে আছে এ হোটেল তার জন্য নিরাপদ তো নয়ই, বরং মৃত্যুগহ্বর। শত্রুর খাঁচায় বন্দী সে এখন, অবশ্য নিজে ইচ্ছা করেই শত্রুর খাঁচায় প্রবেশ করেছে বনহুর। দুগ্ধফেনিল কোমল বিছানায় শুয়ে এপাশ-ওপাশ করছিলো। ডিমলাইট জ্বলছে, স্বল্প আলোতে বনহুরের দৃষ্টি চলে গেলো টেবিলে রাখা খাবার রেকাবিটার নিচে। বনহুর খেয়েছিলো বিনা দ্বিধায়। খাবারে কোনো বিষাক্ত ওষুধ মেশানো আছে কিনা পরীক্ষা করে দেখেছিলো সে। তার পকেটে একটি হোট মেশিন আছে, তাতেই ধরা পড়ে–খাবারে কোনো বিষ বা ঐ ধরনের ওষুধ মেশানো থাকলে মেশিনে ঘড়ির কাঁটার মত মত টিক টিক শব্দ হতে থাকবে–তখন বনহুর ঐ খাবার খায় না।

আজ খাবারের থালা সামনে নিয়ে পকেটের ক্ষুদে মেশিনটায় শব্দের প্রতীক্ষা করছিলো। কিন্তু না, মেশিন কোন সতর্কবাণী শোনালো না। বনহুর নিশ্চিন্তে রেকাবির খাবার খেয়েছিলো, কিন্তু থালার নিচে কাগজের টুকরাটা তার নজরে পড়েনি। সে শয্যা ত্যাগ করে টেবিলের পাশে এসে রেকাবিটা সরিয়ে ভাজকরা কাগজের টুকরাটা তুলে নেয় হাতে। ইংরেজীতে লেখা মাত্র একটি লাইন

এ মুহূর্তে হোটেল মান্দান ত্যাগ করুন।

বনহুর পাশের চেয়ারে বসে লেখাটা বার দুই পড়েছে সেই দতেই একটা শব্দ হলো, ফিরে তাকাতেই বিস্ময় জাগলো তার দু'চোখে। অদ্ভুত পোশাকরা লোক দু'জন তাদের দুহাত বাড়িয়ে এগিয়ে আসছে।

বনহুর পাশের চেয়ার তুলে ছুঁড়ে মারলো একজনকে লক্ষ্য করে। আশ্চর্য হলো বনহুর, চেয়ারখানা ওর শরীরে লেগে ছিটকে পড়লো মেঝেতে।

তবুও এগিয়ে আসছে লোক দুজন।

বনহুর পাশের টেবিলটা কাৎ করে মাঝখানে একটা দেয়াল সৃষ্টি করলো।

কিন্তু লোক দু'জন টেবিল না সরিয়ে দিব্যি তার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। টেবিলটা উল্টে পড়ে গেলো এবং টেবিলের উপরে পা রেখে পেরিয়ে এলো।

বনহুর আরও সরে গেলো। পাশের তাকে ছিলো একটি ফুলদানি। ফুলদানিটা বেশ ভারী, পিতল অথবা ব্রোঞ্জের তৈরি। বনহুর সেই ভারী ফুলদানিটা নিয়ে ছুঁড়ে মারলো। একটুও নড়লো না ওরা। যে ভাবে আসছিলো ঠিক সেইভাবে এগোচ্ছে।

বনহুর একটি লৌহ আলমারীর আড়ালে দাঁড়ালো।

লোক দুজন এক ঝটাকায় কাগজের বাক্সের মতো সরিয়ে ফেললো আলমারীখানা। তারপর দ্রুত ধরতে গেলো বনহুরকে।

বনহুর বুঝতে পারলো চলন্ত যন্ত্রমানব ওরা দু'জন। নিশ্চয়ই এই হোটেলকক্ষের কোনো স্থানে বসে এই যন্ত্রমানব দু'জনকে চালনা করছে জীবন্ত এক মানুষ—যার পরিচয় লৌহমানব। বনহুর এবার কক্ষের চারদিকে তাকালো, কোন্ পথে এই কক্ষ থেকে বেরিয়ে যাওয়া যাবে। সামনে দরজা বন্ধ।

হঠাৎ একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এলো....হা আমিই লৌহমানব। আমার আমন্ত্রণেই তুমি এসেছো মানদ্বীপে। হোটেল মান্নান আমার কারবার স্থান এবং আমার আস্তানা। তুমি পালাতে পারবে না, কোনো পথ নেই যে পথে তুমি বেরিয়ে যাবে মান্দান থেকে।

বনহুর বুঝতে পারলো যত সহজ মনে করেছিলো সে ততখানি সহজ নয়। বনহুর এবার আলমারীটা ধরে সজোরে ঠেলে দিলো, সঙ্গে সঙ্গে একটা অদ্ভুত কান্ড ঘটে গেলো। আলমারীটা সরে যেতেই একটি দরজা বেরিয়ে পড়লো। মুহূর্ত বিলম্ব না করে সে সেই পথে প্রবেশ করলো। পকেট থেকে বের করে নিলো ক্ষুদে তেজদীপ্ত রিভলভারটা।

বনহুর দ্রুত এগোতেই সামনে বৃহৎ আকার একটি কক্ষ নজরে পড়লো। কক্ষটির মধ্যে নানা ধরনের বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম। বিস্ময়কর আসবাবপত্র, ফিরে তাকাতেই দেখতে পেলো একটি চেয়ারে বসে আছে একটা পোক, তার সামনে কয়েকটি সুইচ। বনহুরকে দেখামাত্র সে একটি সুইচ টিপলো।

সঙ্গে সঙ্গে বনহুর গুলী ছুঁড়লো চেয়ারে উপবিষ্ট লোকটাকে লক্ষ্য করে।

কিন্তু আশ্চর্য তার রিভলভারের গুলী লোকটার দেহ স্পর্শ করে ছিটকে পড়লো। লোকটা হেসে উঠলো ভীষণভাবে—হাঃ হাঃ হাঃ বনহুর, আমাকে তুমি হত্যা করবে, এমন শক্তি তোমার আছে! পারবে না আমার এতটুকু ক্ষতি করতে।

বনহুর অনুভব করলো, তার দুপাশে পূর্বের সেই যন্ত্রমানবদ্বয় তাকে ধরবার জন্য হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। এই মুহূর্তে বনহুর বন্দী হবে যন্ত্রমানবদ্বয়ের হাতে। বনহুর বুঝতে পারলো। আসনে উপবিষ্ট লোকটিই সুইচ টিপে যন্ত্রমানবদ্বয়কে চালনা করছে।

এবার বনহুর মরিয়া হয়ে লাফিয়ে সরে দাঁড়ালো এবং ছুটে গিয়ে জাপটে ধরলো আসনে উপবিষ্ট লোকটাকে। কিন্তু আরও আশ্চর্য হলো বনহুর, লোকটাকে একচুলও নড়াতে পারলো না সে। বনহুর বুঝতে পারলো লোকটা সুইচ টিপছে এবং কথা বলছে, কিন্তু আসলে সে জীবন্ত কোনো মানুষ নয়। বনহুর আরও বুঝতে পারলো ওটা একটা মনুষ্যাকৃতি মেশিন। অপর কোন গোপনকক্ষ থেকে কোনো ব্যক্তি সুইচ চালনা করছে এবং এই যান্ত্রিক লোকটি তারই অনুকরণে কাজ করছে। বনহুর মুহূর্ত দেরী না করে যান্ত্রিক লোকটির সামনে যে সুইচগুলো ছিলো সেগুলো এলোপাতাড়ি টিপতে লাগলো। মাঝে মাঝে তাকাচ্ছে বনহুর সেই যন্ত্রচালিত লোক দুটির দিকে। এবার বনহুর যখন উপবিষ্ট লোকটির সম্মুখস্থ সুইচগুলো এলোপাতাড়িভাবে টিপছিলো, তখন সেই বিস্ময়কর লোক দু'জনও এলোপাতাড়িভাবে এদিক ওদিক বিক্ষিপ্তভাবে ছুটলো। তাদের সামনে যা পাচ্ছে তারা ধাক্কা খেয়ে ভেঙে চুরমার করে দিচ্ছে। ওদের দেখলে মনে হচ্ছে ওরা যেন ক্ষ্যাপা গরিলা, উন্মাদ হয়ে উঠেছে।

বনহুর হেসে উঠলো আপন মনে। তারপর বললো, হে যন্ত্রমানব, তোমার সবকিছু আমার কাছে ফাস হয়ে গেছে। এবার তোমার সঙ্গে আমার শক্তি পরীক্ষা শুরু।

সম্মুখ আসনে উপবিষ্ট যান্ত্রিক লোকটির মুখ দিয়ে শব্দ উচ্চারিত হলো– কৌশলে তোমাকে হাতের মুঠায় এনেছি, যত শক্তিই তোমার থাক কিন্তু নিস্তার নেই। তোমার শক্তির পরীক্ষা সবে মাত্র শুরু।....

বনহুর তবুও সুইচগুলো অবিরত টিপছে। আর যন্ত্র মানব দুটি একবার ওদিক একবার এদিক ছুটছে এবং নানা রকম যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র উল্টেপাল্টে ফেলে দিচ্ছে। বনহুর বুঝতে পারলো এই সুইচগুলোই যান্ত্রিক লোক দুটিকে চালনা করছিলো।

আর বিলম্ব না করে বনহুর এবার দেয়ালে ঝুলন্ত একটি চেইন ধরে হেঁচড়া টান দিলো, অমনি মেঝেটা দুলে উঠলো, তারপর দেখতে পেলো পায়ের নিচে একটা

সুড়ঙ্গপথ বেরিয়ে পড়েছে।

বনহুর দ্রুত সেই সুড়ঙ্গপথে নামতে লাগলো।

ধাপগুলো বেশ খাড়া, বনহুর নামতে লাগলো নিচের দিকে।

কিছুক্ষণ নামবার পর আবার বনহুরের কানে ভেসে এলো সেই কণ্ঠস্বর... পালাতে পারবে না বনহুর। তোমার বুদ্ধির বাহাদুরি এখানেই শেষ। বনহুর নিচে তাকিয়ে দেখলো সিঁড়ির ধাপ মিশে গেছে ভীষণ খরস্রোত জলরাশির মধ্যে। সেকি ভয়ংকর জলোস, পাক খেয়ে আছড়ে পড়ছে সিঁড়ির ধাপগুলোর উপরে।

বনহুর কোনো দিকে না তাকিয়ে লাফিয়ে পড়লো জলোচ্ছাসের মধ্যে। সঙ্গে সঙ্গে তলিয়ে গেলো সে।

*

ভয়ংকর জলোচ্ছ্বাস বনহুরকে টেনে নিয়ে চললো। যেকোনো মুহূর্তে পাথরের আঘাতে তার দেহটা থেতলে যেতে পারে। মাঝে মাঝে বনহুর যখন ভেসে উঠছে তখন নিঃশ্বাস গ্রহণ করছে। কিন্তু অন্ধকারে কিছুই তার দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না।

বনহুর সবসময় নিজেকে রক্ষার জন্য সাবধানে ডুবন্ত পাথর খন্ড গুলোকে এড়িয়ে চলছে। বেশ কিছু সময় চলার পর বনহুর সূর্যের আলো দেখতে পেলো। আলোটা চোখে পড়ায় বনহুর বুঝতে পারলো এবার সে ঐ লৌহমানবের ব্যূহ ভেদ করে বেরিয়ে আসতে পেরেছে। প্রচন্ড জলোস তাকে যেন ডুবন্ত মার্বেলের মত গড়িয়ে নিয়ে এসেছে। এখন জলোচ্ছাস কিছুটা হাল্কা মনে হচ্ছে।

বনহুর চেষ্টা করছে হাতের কাছে কিছু পেলে ধরে ফেলবে কিন্তু ভাসমান কোনো বস্তুই তার নজরে পড়লো না। এখন বনহুর দেখছে, যে পথে খরস্রোত জলোচ্ছাস ভয়ংকরভাবে ছুটে চলেছে তারই ধারে কোনো শেকড় বা আগাছা দেখা যায় কিনা, তাই বনহুরের দৃষ্টি সব সময় জলোচ্ছ্বাসের কিনারের দিকে রয়েছে।

ক্রমান্বয়ে জলোম্মসের বেগ অনেকটা কম মনে হচ্ছিলো।

দেহটা ভাসিয়ে দিয়েছিলো বনহুর, কারণ সুদীর্ঘ সময় সে জলোচ্ছাসের সঙ্গে একরকম প্রায় যুদ্ধে লিপ্ত ছিলো। হঠাৎ তার সামনে একটি বড় রশি ভেসে যেতে দেখতে পেলো। বনহুর এক মুহূর্ত বিলম্ব না করে ধরে ফেললো ভাসমান রশিটা। রশিটা ধরবার সঙ্গে সঙ্গে আঁতকে উঠলো সে। রশিটা ভীষণ ঠান্ডা আর পিছল। তবুও ছাড়লো না সে রশিটাকে। শক্ত করে আঁকড়ে ধরে রইলো।

রশিটা বনহুরকে তীরের দিকে টেনে নিয়ে চললো।

বনহুর অতি কষ্টে রশিটা শক্ত করে ধরে রেখেছে। হাত দু'খানা বারবার খসে যাচ্ছিলো, তবুও ধরে রইলো সে। কিছুক্ষণের মধ্যেই বনহুরকে নিয়ে পিছল রশিটা তীরে উঠে এলো। বনহুর যা মনে করেছিলো তাই, আসলে সেটা কোনো রশি বা দড়ি নয়, একটা বিরাট সাপ। সাপটার মাথাটা প্রবেশ করানো ছিলো তীরের একটি ফাটলের মধ্যে। যে অংশ ধরে বনহুর তীরে উঠে আসতে সক্ষম হলো সে অংশটা ঐ সর্পরাজের লেজের অংশ। বনহুর বুঝতে পারলো ঐ সর্পরাজ জলোচ্ছাসের ওপর থেকে এপাড়ে পার হয়ে আসছিলো। সর্পরাজের মস্তকের ভাগটি এপাড়ে পৌঁছে গিয়েছিলো আর লেজের ভাগ প্রায় চলে আসছিলো, ঐ মুহূর্তে বনহুর লেজটা ধরে ফেলে এবং কৌশলে উঠে আসে তীরে। খাড়া তীর, চারদিকে শুধু ধূ ধূ বালু।

বনহুর তীরে দাঁড়িয়ে একবার সর্পরাজের দিকে তাকিয়ে দেখে নিলো। ততক্ষণে সর্পরাজের গোটা লেজটা তীরের বিরাট ফাটলটার মধ্যে প্রবেশ করেছে। লেজের শেষ অংশটুকু শুধু দৃষ্টিগোচর হলো তার। যা হোক, সর্পরাজকে মনে মনে ধন্যবাদ জানালো বনহুর, তারপর চলতে শুরু করলো।

দূরে বেশ ঝোঁপ-জঙ্গল দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। তবে কি ওখানে কোনো শহর নগর বা বস্তি এলাকা আছে যাই থাক তাকে ঐ ছায়াঘেরা বনাঞ্চলের নিকটে পৌঁছতেই হবে।

দ্রুত পা চালিয়ে চললো বনহুর।

জলোচ্ছাসের নালাটি আঁকাবাঁকা হয়ে ছুটে চলেছে। এদিকে জলোচ্ছ্বাসের গতি কিছুটা মন্থর। তবুও গভীরতা ও বেশ স্রোত রয়েছে। বনহুর চলেছে, তার শরীরের প্যান্ট-শার্ট, জুতো ভিজে চুপসে গেছে।

বালির মধ্যে পা টেনে টেনে চলতে হচ্ছিলো তাকে।

বেশ কিছুটা চলার পর হটাৎ তার কানে ভেসে এলো মোটর সাইকেলের ক্ষীণ শব্দ। থমকে দাঁড়ালো সাইকেলে দুজন লোক দ্রুত তার দিকে এগিয়ে আসছে। বনহুর তার চোরা পকেট থেকে ক্ষুদে দূরবীক্ষণ যন্ত্রটা বের করে চোখে লাগিয়ে ভালভাবে লক্ষ করলো। সে দেখতে পেলো, মোটর সাইকেল যাত্রীদ্বয় অদ্ভুত পোশাক পরিহিত। তাদের মুখে মুখোস, পায়ে কালো জুতো এবং হাতে আগ্নেয়াস্ত্র আছে। তবে কি ওরা সেই লৌহমানবের লোক?

বনহুর নিজেকে প্রস্তুত করে নেয়।

ততক্ষণে এগিয়ে এসেছে মোটর সাইকেল আরোহীদ্বয়।

বনহুর তবুও এগোতে থাকে, তার কানে প্রতিধ্বনিত হয় একটা কর্কশ আওয়াজ।

ওরা বনহুরের কাছাকাছি এসে মোটর সাইকেল রেখে নেমে পড়ে এবং আক্রমণ করে তাকে দুজনে দু'পাশ থেকে।

বনহুর পাল্টা আক্রমণ চালায়। তার প্রচন্ড ঘুষির আঘাতে ছিটকে পড়ে দুজনে বালুকারাশির ওপর।

বনহুর মুহূর্ত বিলম্ব না করে একটি মোটর সাইকেলে চেপে বসে স্টার্ট দিলো, তারপর উল্কাবেগে ছুটে চললো।

আক্রমণকারীদ্বয় ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়ে তাকালো সামনে বনহুরের পানে।

বনহুরের গাড়িখানা ততক্ষণে বেশ দূরে এগিয়ে গেছে।

বালুকারাশির উপর দিয়ে মোটর সাইকেল এত দ্রুত চালাচ্ছিলো বনহুর যে, তার নাগাল পাওয়া ওদের পক্ষে কষ্টকর। ওরা দু'জন তাড়াতাড়ি একই মোটর সাইকেলে উঠে বসলো এবং বনহুরকে অনুসরণ করলো।

বেশ কিছুটা এগুনোর পর হঠাৎ বনহুরের দৃষ্টিগোচর হলে সামান্য জলস্রোতের নালা পথরোধ করে ফেলেছে। ঐ স্থানে জলস্রোতের বেগও খুব তীব্র। বনহুর

বুঝতে পারলো ওরা তাকে আক্রমণ চালাবার জন্য দ্রুত এগিয়ে আসছে। বনহুর তার গাড়ির স্পীড আরও বাড়িয়ে দিলো এবং ভীষণ ঝুঁকি নিয়ে জলোস্ট্রসের ওপাশে লক্ষ রেখে গাড়িসহ শূন্যে লাফিয়ে পড়লো। তার ভাগ্য প্রসন্ন বলতে হবে তাই বনহুর তার গাড়িসহ ওপারে এসে পড়লো।

আশ্চর্য হলো বনহুর মোটর সাইকেলটি যেন শূন্যে ভেসে জলোচ্ছাসের ওপারে তাকে পৌঁছে দিলো। শুকরিয়া আদায় করলো বনহুর আল্লাহর নিকটে। বিপদগ্রস্তকে আল্লাহ এভাবেই রক্ষা করেন। ফিরে তাকালো বনহুর, দেখতে পেলো ওরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে থমকে দাঁড়িয়ে আছে ওপারে। কিন্তু একটু পরই ওদের মোটর সাইকেলখানা শূন্যে লাফিয়ে উঠলো, উদ্দেশ্য বনহুরকে ধরে ফেলা। কিন্তু ওরা সফল হলো না, মোটর সাইকেলসহ দু'জন গভীর জলোচ্ছাসের মধ্যে পড়ে গেলো। তারপর সঙ্গে সঙ্গে তলিয়ে গেলো মোটর। সাইকেলখানা আরোহীদ্বয়কে নিয়ে।

বনহুর হাসলো আপন মনে, তারপর আবার ছুটলো সামনের দিকে। দূরে বহু দূরে কালো রেখার মত নজরে পড়লো কোনো শহর অথবা লোকালয়।

মোটর সাইকেলে বনহুর এগুতে লাগলো সেইদিকে।

ঘন্টা দুই গাড়ি চালিয়ে বনহুর সেই কালো রেখার কাছাকাছি এসে পড়লো। দেখতে পেলো শহর নয়, একটা লোকালয়। রাস্তা দিয়ে যানবাহন চলেছে। বেশ কিছু কলকারখানা নজরে পড়ছে। অদূরে বস্তি এলাকা, ছোট ছোট ঘর,চুন-বালি খসে পড়েছে, চুল্লির কালিতে দেয়ালগুলো কালো হয়ে উঠেছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়ে উলঙ্গ-অর্ধ উলঙ্গ অবস্থায় পথের ধারে ধূলাবালি নিয়ে খেলা করছে।

বনহুর তার মোটর সাইকেল ঠেলে নিয়ে এগিয়ে গেলো ওদের দিকে। একটি বৃদ্ধা কূপ থেকে পানি উঠাচ্ছিলো। বনহুর তার পাশে গিয়ে বললো—একটু পানি খাওয়াতে পারো?

বনহুর কথাটা ইংরেজীতে বললো।

বৃদ্ধা কূপ থেকে জগভর্তি করে পানি উঠিয়ে নামিয়ে রাখলো নিচে, তারপর বনহুরের পা থেকে মাথা পর্যন্ত ভাল করে তাকিয়ে দেখে নিয়ে ভাঙা ভাঙা ইংরেজীতে বললো–তুমি কোথা থেকে আসছে?

বনহুর বললো—-বহুদূর থেকে। সে বুঝতে পারলো তার পোষাক এবং চুল জলোচ্ছাসে ভিজে যাওয়ার পর অর্ধশুষ্ক হওয়ায় বেখাপ্পা লাগছে তাকে, আর সেইজন্যই বৃদ্ধা তার দিকে সন্দীহান দৃষ্টি নিয়ে তাকাচ্ছে। একটু হেসে বললো সে–তোমাদের দেশটা দেখতে এসেছি, যদি কোনো একটা কাজ পাই করবো। বেকার কিনা তাই…

বৃদ্ধার মনে দয়ার সঞ্চার হলো যখন সে জানতে পারলো লোকটা বেকার। হয়তো বা তার সন্তানও একদিন ওর মতই বেকার ছিলো। বললো বৃদ্ধা–এসো আমার সঙ্গে…বৃদ্ধা জগভর্তি ঠান্ডা পানি নিয়ে চললো তার কুঁড়েঘরটির দিকে।

বনহুর তাকে অনুসরণ করলো।

মোটর সাইকেলখানা ঠেলে নিয়ে এগুতে লাগলো সে বৃদ্ধার পেছনে পেছনে।

বৃদ্ধার বাড়ি বেশীদূর নয়, সামনে গোলপাতার বেড়া দিয়ে ঘেরা ছোটো উঠান। ওপাশে একটি চুন-বালি উঠে যাওয়া ঘর। বারান্দা ছোট, একপাশে চুল্লি, ঐ চুল্লিতে রান্না করে বৃদ্ধা। চুল্লির কালিতে দেয়াল এবং ঘর কালো হয়ে গেছে।

বৃদ্ধ বনহুরকে বারান্দায় একটা মোড়ায় বসতে দিয়ে বললো—তুমি বসো, আমি পানি আনছি।

বনহুর তার মোটর সাইকেলখানা বাইরে রেখে উঠানে প্রবেশ করেছিলো। মোড়াটায় বসে হাতের পিঠে ললাটের ঘাম মুছে তাকালো বৃদ্ধা যে পথে ঘরে প্রবেশ করলো সেইদিকে।

কিছুক্ষণ পর বৃদ্ধা বেরিয়ে এলো, তার এক হাতে একটা রেকাবিতে ভুট্টার মোয়া। অন্য হাতে এক গ্লাস পানি। বনহুরের সামনে বাড়িয়ে ধরে বললোনাও খেয়ে নাও বাছা।

বনহুর ক্ষুধার্ত ছিলো, পিসাসায় গলাটা যেন শুকনো কাঠ হয়ে গেছে। জলোচ্ছাসে পানি খুব লবণাক্ত ছিলো, মুখে কিছুটা পানি প্রবেশ করায় বনহুর অসুস্থ বোধ করছিলো এখন অবশ্য অনেকটা সামলে উঠেছে সে। বৃদ্ধার দেওয়া ভুট্টার মোয়া খেলো সে, তারপর টান্ডা পানি পান করলো।

এখন বনহুর বেশ সুস্থবোধ করছে।

বৃদ্ধা বললো–তুমি আমার ছেলের বয়সী। আর সেজন্যই তোমার প্রতি আমার মায়া জন্মে গেছে।

বললো বনহুর–তোমার ছেলে আছে?

হাঁ

কোথায় সে।

শহরে কাজ করে। আরো একটা ছেলে ছিলো, কলে কাজ করতে গিয়ে করাতে কেটে মারা গেছে। বড় ছেলেটা কোনো কাজ না পেয়েই তো শহরে চাকরি করছে।

ও, তাহলে তোমার কাছে কেউ নেই বুঝি?

না। ছেলেটা কোথায় চাকরি করে তাও জানি না, তবে মাঝে মধ্যে আসে। বড় ভালো ছেলে আমার...জানো বাবা, আমার ছেলে ভুট্টার খই ও মোয়া খেতে খুব ভালবাসে, তাই তৈরি করে রেখেছি হঠাৎ এসে পড়লে খাবে।

ও তাই তুমি প্রতিদিন ছেলের প্রতীক্ষা করো?

হাঁ।

আচ্ছা, এবার তাহলে চলি বুড়ীমা?

না না তা হয় না, তুমি অতিথি। বহুদূর থেকে এসেছো। আমি তোমার মায়ের মত, থাকোনা আমার বাড়িতে। থাকবে?

বনহুর ভাবলো, নতুন অজানা জায়গা, কোথায় যাবে। এখানে থাকলে মন্দ হয় না। এখান থেকে কত দূর মানদ্বীপ কে জানে, তবে খুব বেশি দূরে হবে না বোধ হয় মানদ্বীপ নগরী...

কি ভাবছো বাছা? কোনো কষ্ট তোমাকে দেবো না। আমি একা থাকি, তুমি থাকলে অনেক ভাল লাগবে। দেখছোনা কেউ নেই আমার সঙ্গে কথা বলার। বস্তি এলাকায় বহু মানুষ আছে কিন্তু ওরা সবাই নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত, আমার সঙ্গে কথা বলার সময় নেই তাদের।

বললো বনহুর—-তুমি যখন বলছো থাকবো। তুমি আমার মায়ের মত…

বনহুর মুখে কথাটা বললেও ভেতরে ভেতরে ভাবলো, বুড়ীর মতলব খারাপ না তো? দেখাই যাক না কি হয়!

বনহুর থেকে গেলো বুড়ীর বাড়িতে।

রাতে বৃদ্ধা মাচায় আর বনহুর শুলো মেঝেতে গোলপাতার চাটাই বিছিয়ে। রাতে বনহুর মাংস আর রুটি পেট পুরে খেলো, যদিও বৃদ্ধার হাত দু'খানা তেমন পরিষ্কার ছিলো না, কেমন যেন নোংরা মনে হচ্ছিলো তবুও খেতে হলো তাকে।

খেতে খেতে বলেছিলো বনহুরবুড়ীমা এ কিসের মাংস

কেন, খারাপ লাগছে নাকি?

না না খুব মজা। ভাল লাগছে খেতে।

দুম্বার মাংস। আমাদের বস্তি এলাকায় রোজ দুম্বা জবাই হয়। আমি মাছ ভালবাসি না তাই ছেলে বলেছে, রোজ গোস্ত কিনে খেও। রোজ দুম্বা জবাই হলে আমি গোস্ত কিনে আনি। খাবার সময় নানা গল্প হয়েছিলো বনহুরের সংগে ছেলে, স্বামী আর বস্তির লোকদের নিয়ে।

গোলপাতার চাটাইখানায় শুয়ে বললো বনহুর–সত্যি বুড়ীমা, তুমি কত ভাল। আমার মা তোমার মত খুব ভাল ছিলো।

বৃদ্ধা বললো—তোমার মা নেই বুঝি?

বললো বনহুর–না! চলে গেছে আমার মায়া ত্যাগ করে।

মায়ের কথা মনে হতেই দু'চোখ ভরে পানি এলো, ঢোক গিলে বললোমার সংগে দেখা হবে ওপারে, সেই দিন গুণছি বুড়ীমা।

আমি বুঝতে পারছি তোমার ব্যথা। আমারও মা ছিলো, বাবা ছিলো, স্বামী ছিলো– সবাই এক এক করে ছেড়ে চলে গেছে ওপারে। পেটে জন্ম নিলো দুটো ছেলে। তার একজন চলে গেলো। জানো বাছা, বাবা-মা-স্বামী মরায় আমি তেমন ভীষণভাবে ঘাবড়ে যাইনি, কিন্তু ছেলেটা যেদিন মিলের চাকায় পিষে থেতলে

মরলো সেদিন আমি খুব ঘাবড়ে গিয়েছিলাম।...এমন ব্যথা আমি কোনোদিন পাইনি। কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হয়ে এলো বৃদ্ধার। হ্যারিকেনের ম্লান আলোতে কক্ষটা থমথমে হয়ে উঠেছে। বৃদ্ধা হাত দিয়ে চোখের পানি মুছলো।

বনহুরের কানে প্রতিধ্বনিত হলো বৃদ্ধার শেষ কথাগুলো। বনহুর বললোথাক বুড়ীমা, আর ওসব কথা না বলাই ভাল। ঘুমাও তুমি...

বললো বৃদ্ধা–তুমি যখন আমার অনুরোধে থেকে গেলে তখন তোমাকে অনেক কথা বলবো। তুমি বড় ভাল মানুষ বলেই আমার ধারণা।

বললো বনহুর–বুড়ীমা, তোমার ধারণা সত্য। আমি ভাল মানুষের কাছে বড় ভাল আর যে মন্দ তার কাছে ভয়ংকর।

না বাছা, তুমি ভালই–নইলে আমি থাকতে বললাম তাতেই রাজি হয়ে গেলে। আমি বুড়ো মানুষ তাই কেউ আমার কথা শুনতে চায় না।

বলো বুড়ীমা, আমি শুনবো। বললো বনহুর।

বস্তি এলাকা, কোনো ঘর থেকে ভেসে আসছে স্বামী-স্ত্রীর কলহের আওয়াজ। হয়তো কাজ থেকে ফিরে কোনো বিষয় নিয়ে ঝগড়া বেঁধেছে। কোনো ঘর থেকে শোনা যাচ্ছে শিশুর কান্নার আওয়াজ।

বনহুর কিছুক্ষণের জন্য অন্যমনস্ক হলেও বৃদ্ধার কথায় সজাগ হয়ে কান পাতলো।

বৃদ্ধা বলছে-আমার বয়স যখন দশ বছর তখন আমার বাবা মরে। তাকেও ওরা খুন করেছিলো মেশিনের চাকায় পিষে। যেমন আমার ছেলেকে পিষে মেরেছে। আমার স্বামীকেও খুন করেছে ঐ একইভাবে...

বনহুর বললো—বুড়ীমা, তোমার বাবা আর স্বামী-সন্তান সবাই কল-কারখানায় কাজ করতো?

হাঁ হাঁ বাছা, বড় গরিব আমরা, সেই কারণেই আমরা সবাই কল-কারখানায় শ্রমিকের কাজ করে মুখের আহার সংগ্রহ করি। জানো বাছা, মালিকরা সব সময় শ্রমিকদের ঠকায়। কাজ করিয়ে নেয় কিন্তু পয়সা ঠিকমত দেয় না।

এ কথা ঠিক বুড়ীমা...যদিও বনহুর মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিলো তবুও তার কানে বৃদ্ধার কথাগুলো স্পষ্ট হয়ে বাজছিলো। সত্যিই শ্রমিকরা সব সময় মালিকদের কাছে নিষ্পেষিত হয়ে আসছে। তাদের পরিশ্রমের উচিত মূল্য কোনোদিনই পায় না।

বৃদ্ধা বলে চলেছে...এই যে বস্তি এলাকা দেখছো বাছা, এখানকার সবাই এই কল কারখানায় কাজ করে। আর এই এলাকা জুড়ে কলকারখানা সবই এক মালিকের। কাংগার অঞ্চলের মালিক মহাথর উদরী। মস্তবড় ধনী লোক মহাথর, কিন্তু তার দয়ামায়া বলতে কিছু নেই। মহাথরের বাবা জগনাথথর ছিলো পাষন্ড, আমার বাবাকে সে কৌশলে হত্যা করেছে। আমার স্বামী আর ছেলেকে হত্যা করেছে মহাথর...শয়তান বড় লোভী, আমি ওর কলিজা টেনে ছিঁড়ে নিতাম যদি আমার দু'হাতে জোর থাকতো।

বললো বনহুর—কেন মহাথরের বাবা তোমার বাবাকে হত্যা করেছিলো?

সে অনেক কথা। আমার বাবা খুব জেদী মানুষ ছিলো, কাজ করতে যেমন, তেমনি তার প্রাপ্য ঠিকমত আদায় করে নিতে। মালিক বলে তোষামোদ সে করতো না, মাঝেমধ্যেই মালিকের সঙ্গে তার কথা কাটাকাটি হতো আর সেই কারণেই বাবাকে কৌশলে খুন করা হলো। বাবা মেশিনের মেরামত কাজ করছিলো, সেই সময় মালিকের ইঙ্গিতে মেশিন চালু করে দেওয়া হয়। বাবা মেশিনের চাকার দাতে খন্ডবিখন্ড হয়ে মারা যায়। শয়তান মালিক বাবার জন্য শোক দিবস পালন করেছিলো। বাবার জন্য দুঃখ করে রুমালে চোখের পানি মুছেছিলো, তাকে অন্ধকারে কে বা কারা মাথায় ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে মেরে ফেলেছিলো। যে শ্রমিক ওদের বিরোধিতা করতো তাকেই ওরা দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিতো। বহু শ্রমিককে মালিক খুন করেছে এ কথা আমাদের বস্তির মানুষ সবাই জানে। তবুও তারা চাকরি করে, কারণ এরা বড় গরিব, মিলকারখানায় কাজ করা ছাড়া এদের কোনো উপায় নেই, আর সেজন্যই মালিকের কুচক্রের শিকার হয়েও তারা কাজ করে যায়।

এক নিঃশ্বাসে বৃদ্ধা কথাগুলো বললো।

থামলো সে একটু, তারপর আবার বলতে শুরু করলো-বুড়ো মালিক একদিন মরে গেলো কঠিন ব্যারামে। তার ছেলে মহাথর বাপের আসন দখল করলো। হাঁ, বাপের শিক্ষাই সে পেয়েছিলো, তাই বাপের মতোই জানোয়ার হলো সে, বরং

বাপের চেয়ে আরও দশগুণ বেশি লোভ-লালসা হলো তার। শ্রমিকদের ওপর নির্মম অত্যাচার শুরু হলো, যারা তার আচরণের প্রতিবাদ করতো তাকেই দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিতে লাগলো মহাথর। আমার স্বামী বৃদ্ধ হলে কি হবে তার দেহ ছিলো কাঠের গুঁড়ির মত শক্ত আর মজবুত। কাউকে পরোয়া করতো না সে। মহাথরের আচরণে প্রায়ই সে প্রতিবাদ করতো। তাই তাকে একদিন মেশিনে ফেলে দুফাঁক করে ফেললো নরশয়তানটা। হাঁ, বাপের মতই দুঃসাহসী হলো আমাদের দু ছেলে কাঙ্গো আর মাঙ্গো। কাঙ্গো বড় আর মাঙ্গো ছোট। ওরা বাপের রক্ত নিয়ে কসম করলো এর প্রতিশোধ নেবে। তারা সমস্ত বস্তির লোকজনকে জানালো না খেয়ে মরবে তবুও মহাথরের কারখানায় কাজ করবে না। ঐ দিন রাতেই সুচতুর মহাথর বস্তিতে এলো এবং বস্তির সবার বাড়ীঘরে আগুন ধরিয়ে দিলো। বললো, তারা যদি তার কারখানায় কাজ না করে তবে এ বস্তিতে থাকার কোনো অধিকার তাদের নেই। কারণ এ অঞ্চল মহাথরের বাপের। সে দয়া করে শ্রমিকদের থাকতে জায়গা দিয়েছে, চাকরি দিয়েছে…একটু থামলো বৃদ্ধা। গলাটা কেমন যেন বাষ্পরুদ্ধ হয়ে এলো তবুও, কাদো কাঁদো স্বরে বললো—আমার কাঙ্গে আর মাঙ্গো দলবল নিয়ে কাজে যোগ দিলো। না দিয়ে কোনো উপায় ছিলো না। কোথায় যাবে আর চাকরিই বা পাবে কোথায়। এজন্যই আমার বাছারা আবার মহাথরের কলকারখানায় কাজে যোগ দিলো। তারপর এক সপ্তাহ যেতে না যেতে ছোট ছেলে মাঙ্গেকে ঠিক বাপের মতই নির্মমভাবে হত্যা করলো মহাথর তার দলের লোক দিয়ে…

ক্রমেই যেন বনহুরের ধৈর্যচ্যুতি ঘটছিলো, কঠিন হয়ে উঠছিলো তার মাংসপেশীগুলো। চোখের ঘুম ছুটে গিয়েছিলো, তার, ক্লান্তি-অবসাদ দূর হয়ে গিয়েছিলো। সোজা হয়ে উঠে বসে শুনছিলো সে বৃদ্ধার কথাগুলো। কে এই মহাথর যার এত প্রতাপ!

বৃদ্ধা বলতে লাগলো…ছোট ছেলেটাও খুব শক্তিশালী ছিলো তবে বড় সরল ছিলো মাঙ্গো। বড়টা খুব গোয়াড়, সে চাকরি ছেড়ে দিলো, কাউকে কিছু না জানিয়ে। তারপর সবার অলক্ষ্যে চলে গেলো শহরে। মাঝে মাঝে আসে আমাকে দেখতে কিন্তু লুকিয়ে, সবার অগোচরে। বাছা কাঙ্গো না থাকলে আমি মরে যেতাম। মাঙ্গো চলে যাবার পর আমি আর তেমন শরীরে বল পাই না। সব সময় কান্নাকাটি করতাম তাই কাঙ্গো নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য পালালো ঐ শয়তান মালিকের চোখের আড়ালে। ও যখন আসে তখন বস্তাভর্তি গম আর মাংস আনে,

তাই খেয়ে বেঁচে আছি। বাছা আমার বড় দুঃখী, ওর জন্য আমার চোখে ঘুম নেই। পেট ভরে খেতে পারি না, সব সময় কাজের কথা মনে হয়।

বুড়ীমা, কাঙ্গো আবার কবে আসবে?

সে বড় দুঃখের কথা, আমার ছেলে কাঙ্গোর ছুটি নেই। সে রাতের অন্ধকারে চোরের মত লুকিয়ে আসে। আসবার সময় আমার জন্য খাবার জিনিসপত্র নিয়ে আসে আর কিছু টাকা-পয়সা আনে। তাই দিয়ে সংসার চালাই...

লুকিয়ে আসে! এমন চাকরি সে না করলেই পারে? বুড়ো মা তাকে ঠিকমত যদি দেখতেই না পারে তাহলে,..

আমাদের মালিক যদি তাকে দেখে ফেলে বা জানতে পারে তার কারখানায় কাজ না করে সে অন্য জায়গায় চাকরি করছে তাহলে তাকে মেরে ফেলবে, তাই সে রাতের অন্ধকারে এসে আমাকে দেখে যায়।

বনহুর বললো–এমন লোক তোমাদের মালিক। তাকে একবার দেখতে হয়!

না না বাছা, তুমি তাকে দেখতে যেও না। তোমাকে দেখলে সে কাজে লাগাবে, আর, যদি তার কথামত কাজ না করে তবে তোমাকে জানে মেরে ফেলবে। তোমাকে আমি ঐ, কারখানায় যেতে দেবো না বাছা!

আমি একটা চাকরির খোঁজেই বেড়িয়েছি বুড়ীমা। তোমাদের মালিক যত বদরাগীই। হোক তবুও তো একটা চাকরি মিলবে।

না না বাছা, তুমি দেশে ফিরে যাও। দেশে অনেক চাকরি পাবে, কিন্তু

বুড়ীমা, তুমি মিছেমিছি ভয় পাচ্ছো। তোমার ছেলে আসুক, আমি তার সঙ্গে দেখা না করে যাবো না! তুমি আমাকে কটা দিন থাকতে দেবে?

বৃদ্ধা হাসলো, সে হাসি কেমন যেন করুণ ব্যথাভরা, বললো—তোমার মত একটা ছেলে যদি আমার পাশে থাকতো তবে খুব খুশি হতাম আর তাকে রান্না করে খাওয়াতাম। বড় সখ ছেলেকে কাছে কাছে রাখি কিন্তু পারি না, বড় গরিব তাই ছেলেকে চাকরি করতে পাঠাই। তুমি থাকবে সে তো আমার সৌভাগ্য বাছা, তুমিও আমার ছেলে।

হাঁ বুড়ীমা, তুমি আমার মা, আমি তোমার ছেলে। তুমি আমাকে তোমার ভাতিজা বলেই পরিচয় দিও।

আচ্ছা বাছা, তাই করবো।

তবে নিশ্চিন্তে এবার ঘুমাও বুড়ীমা। মনে করো তোমার একটি ছেলে তোমার পাশে আছে। বনহুর শুয়ে পড়লো।

বৃদ্ধাও তার বিছানায় শুয়ে চোখ বন্ধ করলো।

একসময় ঘুমিয়ে পড়লো ওরা।

বনহুর আপন মনে দাতে দাঁত পিষে বললো–শয়তান পর্বতলে অবৈধ অস্ত্র রক্ষণাবেক্ষণের সুব্যবস্থা করে রেখেছে…

সেখানে কোনো জনপ্রাণী নেই। বুঝতে পারলো বনহুর ওটা গুদাম ঘর বা গুহা কক্ষ। বনহুর চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে অগ্রসর হলো। পর্বততলদেশ বলে এখানে মহাথর বেশি লোজন রাখেনি বা রাখার প্রয়োজন মনে করেনি। হঠাৎ একটা শব্দ হলো, গোঙানির শব্দ। বনহুর বুঝতে পারলো আশেপাশে কোথাও লুকিয়ে আছে মহাথর। কিন্তু শব্দটা দুএকবার শোনা গেলো মাত্র। অনেক সন্ধান করেও বনহুর মহাথরকে খুঁজে পেলো না।

অস্ত্রস্তূপগুলোর চারপাশে ভালভাবে সন্ধান চালালো বনহুর। দক্ষিণ হাতে তার ক্ষুদে রিভলভার এবং বাম হস্তে টর্চলাইট।

এগুতে এগুতে বেশ কিছুটা এগিয়ে গেছে বনহুর, হঠাৎ তার নজরে পড়লো সেই ঝুলন্ত লৌহখাঁচাটা। কিন্তু রাণীও নূর সে খাঁচায় নেই। তবে কি তাদের সরিয়ে ফেলা হয়েছে। বনহুর একটু চিন্তিত হলো, আরও কিছু অগ্রসর হতেই নজরে পড়লো একটি শূন্য ঘূর্ণীয়মান চেয়ার।

বনহুর রিভলভার উদ্যত রেখে চেয়ারটার পাশে গেলো। ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখতে লাগলো। হাঁ, সুকৌশলে তৈরি সে চেয়ারটি। নিশ্চয়ই এই… ঘূণীয়মানে চেয়ারে বসে মহাথর তার নির্দেশ দান করে তাকে। সামনে একটি লাউড স্পীকার মেশিন। এই চেয়ারে বসে সে শুধু নির্দেশ দান করে না, গুহার ভেতরে কোথায় কি হচ্ছে তা সে দেখতেও পায়। মেশিনের সামনে একটি ক্ষুদে

টেলিভিশন ক্যামেরা রয়েছে। নিচে পায়ের কাছে কয়েকটি ক্ষুদে সুইচ। বনহুর ঐ চেয়ারে বসে সুইচে চাপ দিলো, প্রথমটিতে চাপ দিতেই আলো জ্বলে উঠলো। সব স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে বনহুর। অপর সুইচে চাপ দিতেই দেখলো একটি গুহার ছোট্ট কুঠরীর মধ্যে নূর আর রাণীকে শক্ত করে লৌহশিকলে ঝুলন্ত অবস্থায় রাখা হয়েছে। একজন মুখোশধারী চাবুক দিয়ে রাণী ও নূরের শরীরে আঘাত করছে। বনহুরের মুখমন্ডল কঠিন হয়ে উঠলো, যন্ত্রণায় নূর মুখ বিকৃত করছে। রাণীর কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে বনহুরের কানে, মেরো না ওকে আর মেরো না...ওকে আর মেরো না...।

বনহুর মুখ ফেরাতেই দেখলো একটি লাল রঙের বোতাম। একটু আশ্চর্য ধরনের লাগলো বোতামটা। ওপাশে একটি পর্দা তার সঙ্গে একটি তার সংযুক্ত আছে দেখলো বনহুর। আবার ঐ বোতামটিতে চাপ দিলো, সঙ্গে সঙ্গে দেখলো একটি অতি পরিচিত কক্ষ। সোফায় হেলান দিয়ে বসে পেপার পড়ছে নূর এ কক্ষটি নূরের বাংলোর একটি কক্ষ! একটি লোক এসে দাঁড়ালো তার সামনে। কিছু বললো সে। নূর পেপার সরিয়ে তাকালো তার দিকে। লোকটি কিছু বললো। নূর সোজা হয়ে বসলো, তার চোখে-মুখে ফুটে উঠলো একটি বিস্ময়ভরা ভাব। তাড়াতাড়ি আসন ত্যাগ করলো নূর। তারপর সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এলো। একটি গাড়ি অপেক্ষা করছিলো, নূর নেমে আসতেই গাড়ির ড্রাইভ আসন থেকে নেমে দাঁড়ালো ড্রাইভার।

বনহুর চমকে উঠলো, এ গাড়ি মনিরার এবং ড্রাইভারটিও মনিরার ড্রাইভার। তবে কি মনিরার ড্রাইভার নূরকে ধোকা দিয়েছিলো এবং মহাথরের হাতে তাকে তুলে দিয়েছিলো। নিশ্চয়ই এমন কিছু ব্যাপার আছে। বনহুর ভাবছে এবং দেখছে গাড়ির পেছন আসনে নূর বসতেই ড্রাইভার গাড়ি ছাড়লল। তারপর কিছুক্ষণ পর্দায় আর কিছু দেখতে পেলো না। হঠাৎ আবার দেখা গেলো গাড়িখানা হীরা হসপিটালের সামনে এসে থামলো। নূর দ্রুত নেমে গেলো, হসপিটালে প্রবেশ করলো সে। নূর হসপিটালে প্রবেশ করতেই আড়াল থেকে একটি অপরিচিত ব্যক্তি এদিক ওদিক তাকিয়ে এগিয়ে এলো ড্রাইভারের পাশে। ড্রাইভার নূরকে নামিয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, সেও কারো যেন অপেক্ষা করছে বলে মনে হলো। সেই অপরিচিত লোকটি ড্রাইভারের পাশে এসে আর একবার তাকিয়ে দেখলো চারিদিক। তারপর কোর্টের পকেট থেকে বের করলো একড়া নোট। এবার সে নোটের তাড়াটা ড্রাইভারের হাতে দিয়ে পিঠ চাপড়ে দিলো তার।

ড্রাইভার গাড়িতে উঠে বসলো, তারপর গাড়ি স্টার্ট দিয়ে চলে গেলো হসপিটাল এড়িয়ে ছেড়ে।

এরপর আর কিছু দেখা গেলো না। পর্দা অন্ধকার হয়ে পড়লো।

বনহুর বোতামটা টিপে অফ করে দিলো। সে বুঝতে পারলো মুক্তি ক্যামেরাদ্বারা এ ছবি উঠিয়ে নেওয়া হয়েছিলো। নিশ্চয়ই মায়ের কোনো অসুখ বা অ্যাকসিডেন্টের সংবাদ জানিয়ে নূরকে তার বাস ভবন থেকে বের করে আনা হয়েছিলো। এবং তাকে কান্দাই হসপিটালের ভেতরে প্রবেশ করতে দেখা গেলো, তারপর মহাথরের চক্রান্তে সুকৌশলে তাকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছিলো এবং বন্দী করে আনা হয়েছে এখানে।

বনহুরের চোখের সামনে যেন ভাসছে সেই দৃশ্যগুলো।

কিন্তু এখন ভাববার সময় নয়, বনহুর উঠে পড়লো, তারপর অনুসন্ধান চালালো কোথায় কোন গোপন গুহায় নূর এবং রাণীকে লৌহ শিকলে আবদ্ধ করে নির্যাতন চালানো হচ্ছে।

বনহুর এদিক ওদিক ঘুরে সন্ধান চালালো।

হঠাৎ এক সময় তার কানে ভেসে এলো নূরের যন্ত্রণাদায়ক কণ্ঠস্বর।

এবার বনহুরের খুঁজে নিতে বেশি বিলম্ব হলো না।

বনহুর সেই গুহাটার সামনে এসে দাঁড়ালো। আড়াল থেকে লক্ষ করলে যে লোকটা নির্যাতন চালাচ্ছিলো তাকে। এবার যেমনি সে নূরের শরীরে আঘাত করতে গেলো অমনি বনহুর তাকে লক্ষ্য করে গুলী ছুঁড়লো। সঙ্গে সঙ্গে তীব্র আর্তনাদ করে মুখ থুবড়ে পড়ে গেলো মহাথরের অনুচরটি। বনহুর দ্রুত প্রবেশ করলো, তারপর খুলে ফেললো রাণী এবং নূরের হাতের ও পায়ের শিকল। রাণী বললো–বনহুর, মুহূর্ত বিলম্ব করোনা, তাড়াতাড়ি নূরকে নিয়ে তুমি এগুতে থাকো আমিও আসছি তোমার সঙ্গে।

রাণী কথা পরে বলবো, এখন বেরিয়ে যেতে হবে এই গুহা থেকে। মহাথর ভীষণ আহত…

হাঁ, আমাদের সামনে তাকে আনা হয়েছিলো, তাকে দেখলাম তার একটি চোখ দিয়ে কালো রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। যন্ত্রণায় সে কাতরাচ্ছিলো, দু'জন অনুচর তাকে সঙ্গে নিয়ে চলে গেলো। আর ঐ লোকটা রইল আমাদের কাছে। চাবুকের আঘাতে আমাদের নিঃশেষ করার জন্য...যাক পরেই হবে এসব কথা, চলো এবার।

বনহুর নূরকে কাঁধে তুলে নিলো।

নূর তার পিতার কাঁধে দেহটা এলিয়ে দিলো।

ঐ মুহূর্তে দুটি লোক তাদের সামনে এসে পথ রোধ করে দাঁড়ালো।

একজন বললো—কোথায় যাচ্ছো বনহুর! কঠিন কণ্ঠস্বর তার।

বনহুর নূরকে নামিয়ে ফিরে তাকালো।

সঙ্গে সঙ্গে লোক দু'জন আক্রমণ করলো বনহুরকে।

বনহুরও পাল্টা আক্রমণ করলে, প্রচন্ডভাবে এক এক ঘুষি বসিয়ে দিতে লাগলো তাদের চোখেমুখে।

শুরু হলো ভীষণ লড়াই।

রাণী তার রিভলভার হারিয়েছে, মহাথর তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিলো রিভলভার এবং টর্চলাইটখানা। তাই সে এদিক ওদিক তাকাচ্ছিলো একটি কোনো বস্তুর আশায়। সামনে তাকাতেই তার নজরে পড়লো একটি লৌহ শিক। রাণী দ্রুতহস্তে তুলে নিলো শিক বা রডটা, তারপর সে রুখে দাঁড়ালো। এমনভাবে একজনের মাথায় মারলো সে তৎক্ষণাৎ ভূতলে মুখ থুবড়ে পড়ে গেলো। এবার অপরজনের পিঠে আঘাত করলো রাণী। রডের ভীষণ আঘাতে ঢলে পড়লো দ্বিতীয় জন।

পথ মুক্ত।

বনহুর নূরকে কাঁধে তুলে নিয়ে অগ্রসর হলো।

এ পথ বনহুরের তেমন পরিচিত নয়, কারণ তারা এ পথে প্রবেশ করেনি। সিঁড়ি বেয়ে উপরের দিকে উঠতে লাগলো।

নূর মহাথরের নির্যাতনে এবং অনাহারে সংজ্ঞাহীনের মত হয়ে পড়েছিলো। এ কদিনে তার মুখে কোনো আহার পড়েনি। এমন কি পানিও পান করতে দেয়নি তাকে। মহাথরের উদ্দেশ্য ছিলো নূরকে বন্দী করে বনহুরের শক্তিকে খর্বকরা। নূর ডিটেকটিভ হিসাবে এরি মধ্যে অনেক কাজ করেছে যার জন্য বহু মহাথরের সমাপ্তি ঘটেছে। উপযুক্ত শাস্তি প্রাপ্ত হয়েছে তারা এবং অনেকেরই ফাঁসি অথবা যাবজ্জীবন কারাদন্ড কিংবা গুলী করেও হত্যা করা হয়েছে। মহাথর তাই বনহুরকে মুঠায় পুরে, নুরকেও দুনিয়া থেকে সরিয়ে ফেলার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলো।

বনহুরের দৃষ্টির সামনে মূরের এই করুণ মর্মস্পশী রূপ তুলে ধরার জন্যই নুরকে আজও জীবিত রাখা হয়েছিলো। এছাড়াও নূরের ওপর তার অনেক রাগ ছিলো, মহাথরের কয়েকজন লোক জেলে পচে মরছে এখনও। মহাথরের চোরা কারবার, দেশ বিদেশ ছড়িয়ে আছে। কান্দাই শহরেও তার ব্যবসার গোপন শাখা আছে। আর সেগুলোকে জীবিত রাখার জন্যই মহাথর সুকৌশলে বনহুরকে নিজের খাঁচায় আবদ্ধ করতে চেয়েছে।

হঠাৎ সেই বনহুর তার মূল্যবান একটি চক্ষু বিনষ্ট করে দিলো। এটা মহাথরের কতখানি ক্ষতিকর সেই তা বুঝতে পেরেছে। যন্ত্রণাকাতর অবস্থায় মহাথর তার দু'জন অনুচর সহ সরে পড়েছে কারণ তার এ যন্ত্রণা যেন মৃত্যু যন্ত্রণার চেয়েও যেন অধিক।

বনহুর সূতীক্ষ্ণ বুদ্ধিবলে ঝুলন্ত সিঁড়িখানা আবিষ্কার করে ফেললো। এমন এক স্থানে সিঁড়িখানা ছিলো যেখানে হঠাৎ কারো দৃষ্টি যাবে না। বনহুর বুঝতে পারলো এ সিঁড়িখানা অত্যন্ত মজবুত এবং ঝুলন্ত। মহাথর এই পথে সরাসরি চলাফেরা করে থাকে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। যখন মহাথর গুহার মধ্যে প্রবেশ করা দরকার মনে করে তখন উপরিভাগে কোন সুইচ অথবা যন্ত্র আছে যার দ্বারা ঝুলন্ত সিঁড়িখানা গুটিয়ে নেয়, আবার যখন গুহায় নেমে আসে তখন সিঁড়িখানা গুটিয়ে নিচে রাখে। তক্তা এবং পাথরের তৈরি এ সিঁড়ি। ধাপগুলো মসৃণ নয়, একটু এবড়ো থেবড়ো। কেউ হঠাৎ দেখলে ঠিক বুঝতে পারবেনা সিঁড়িটা কিসের তৈরি। বনহুর আর রাণী সেই সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে লাগলো। বনহুরের কাঁধে নূর।

রাণী সজাগভাবে তাকে সহায়তা করে চললো।

বনহুর বুঝতে পেরেছিলো এই পথেই মহাথর তার আহত চক্ষু নিয়ে সরে পড়েছে। হয়তো চিকিৎসার জন্যই সে দ্রুত প্রস্থান করেছে। তাই ভুলক্রমে এবং তাড়াহুড়োর জন্য সিঁড়ি গুটিয়ে ফেলার কথা ভুলে গেছে।

আল্লাহর নিকট শুকরিয়া করে নিলো বনহুর ও রাণী।

অনেক কষ্টে নূরকে সাবধানে কাঁধে নিয়ে বনহুর ও রাণী যখন উপরি ভাগে উঠে এলো তখন নুর আরও বেশি নেতিয়ে পড়েছে। এই মুহূর্তে তার ভাল চিকিৎসা এবং খাদ্য প্রয়োজন।

নীল সচ্ছ আকাশে অসংখ্য তারকারাজি।

চারদিকে থমথমে জমাট অন্ধকার। বনহুর আর রাণী নূরকে শুইয়ে দিয়ে তাকালো চারদিকে।

রাণী বললো—গুহার মধ্যে বোঝা যাচ্ছিলো না এখন রাত না দিন।

হা রাণী, তোমার অনুমান সত্য। এখন গভীর রাত, দেখছোনা চারদিকে কেমন জমাট অন্ধকার। অবশ্য তারকারাজির আলোতে কিছুটা আলোময় লাগছে। তবে এখানে বেশীক্ষণ অপেক্ষা করা মোটেই উচিত নয়।

বনহুর, আমি আমার উড়ন্ত শশারটিকে চলে যাবার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে যাবে আর একটু অপেক্ষা করতে হবে আমাদের। কথাটা বলে রাণী তার ক্ষুদে ঘড়িটার উপরে মুখ রেখে সংকেতপূর্ণ শব্দ উচ্চারণ করলো।

বনহুর আর রাণী মিলে যখন কথা বার্তা হচ্ছিলো তখন নূর ভাবছিলো পুরুষের ড্রেসে কে এই মেয়েটি তার পিতা বনহুরের সঙ্গে কি তার সম্পর্ক, তাদের কথাবার্তায় মনে হচ্ছিলো তারা উভয়ে উভয়কে ভালভাবে জানে-নূর মহাথরের নির্যাতনে জর্জরিত হলেও একেবারে সংজ্ঞা হারায়নি। শরীর নির্যাতনে কাহিল হয়ে পড়েছিলো, তারপর ক'দিন সম্পূর্ণ অনাহার। এমনকি কথাবার্তাও বলার মত অবস্থা ছিলো না নূরের। তবুও ভাবছিলো বনহুর আর মেয়েটিকে নিয়ে।

রাণী যখন নূরকে বন্দী অবস্থায় দেখলো তখন চমকে ওঠেনি শুধু অবাক হয়েছিলো। মহাথর তাহলে অনেকদূর হস্তক্ষেপ করেছে। নূর অবশ্য রাণীকে না চিনলেও রাণীর কাছে নূর অপরিচিত ছিলো না। তাকে রাণী দেখা মাত্র চিনতে পেরেছিলো এবং ব্যথা পেয়েছিলো মনে, কারণ রাণী জানতো নূর ন্যায়ের পথে কাজ করে যাচ্ছে। অন্যায় বরদাস্ত করতে পারে না বলেই সে তরুণ হলেও কঠিন কাজে নিয়োজিত আছে। রাণী নূরকে ভাল ভাবেই জানতে এবং চিনতো উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত সন্তান নূর।

রাণীর সঙ্গে যখন নূরকে লৌহখাঁচায় আবদ্ধ করে রাখা হয়েছিলো তখন রাণীই তাকে বুদ্ধিবলে কঠিন নির্যাতনের থেকে বাঁচিয়ে নিয়েছিলো। কিন্তু তবুও পারছিলো না নূরকে সম্পূর্ণরূপে বাঁচাতে। নূর বুঝতে পারছিলো তরুণবেশী রাণী তাকে রক্ষা করতে চায়।

কিন্তু কেন তার প্রতি রাণীর এ দরদ–ভাবে নূর।

এমন সময় দেখা গেলো আকাশে চক্রাকারে একটি নীলাভ আলো ঘুরপাক খাচ্ছে, বনহুর বললো–রাণী তোমার উড়ন্ত শশার এসে গেছে–এত তাড়াতাড়ি এসে পড়লো–সত্যি তোমাকে অনেক ধন্যবাদ...।

ততক্ষণে উড়ন্ত শশারটি অনেক নেমে এসেছে।

নীলাভ আলোর ছটা ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। যানটি নেমে এলো সামনে। একটি সমতল জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়ালো, যেন একটি আলোর বলয়। ছড়িয়ে পড়ছে নীলাভ আলোর ছটা।

রাণী নূরের মাথাটা কাঁধের উপর হেলিয়ে নিয়ে বসেছিলো এবার রাণী নরকে বসিয়ে ওর মাথায়-পিঠে হাত বুলিয়ে বলে-মূর আর একটু কষ্ট করতে হবে-রাণী দাঁড়িয়ে তাকালো সম্মুখে।

যান থেকে অদ্ভুত পোষাক পরিহিত দু’জন নেমে এলো এবং রাণীকে লক্ষ্য করে কুর্ণিশ জানালো।

বনহুর আর রাণী নূরকে ধরে যানটিতে তুলে নিলো।

চেয়ার ধরনের শয্যা ছিলো যানটির মধ্যে।

নূরকে যত্ন সহকারে শুইয়ে দেয়া হলো।

রাণী বনহুরকে বললো—বনহুর তুমি নূরের পাশে বসো। রাণী সোজা হয়ে দাঁড়াতেই রাণীর একজন অনুচর তার পাশে এসে দাঁড়ালো।

রাণী বললো–ফলের রস নিয়ে আসো। আর ওকে কিছু ফল খেতে দাও। বনহুরকে দেখিয়ে দিলো রাণী।

লোকটা চলে গেলো।

একটু পর ফিরে এলো স্বর্ণ রেকাবিতে বেশ কিছু তাজা ফল এবং এক গেলাস ফলের রস।

রাণী নূরকে তুলে ধরে ফলের রসের গেলাসটা তার মুখে ধরে বললো–নূর খেয়ে নাও। সুস্থ বোধ করবে।

নূর কোনো কথা না বলে তাকালো রাণীর মুখের দিকে, মায়া মমতায় ভরা দুটি চোখ নূর বিনা দ্বিধায় রাণীর হাতে ফলের রস পান করলো।

বনহুর ততক্ষণে রেকাবি থেকে ফল তুলে নিয়ে খেতে শুরু করে দিয়েছে।

লোকটা ফলসহ রেকাবিটা তাদের সামনে টেবিলে রেখে চলে গেলো।

রাণী বসলো বনহুরের পাশের আসনে। পাশাপাশি দুটি আসন। রাণীও বাম হাতে ফল তুলে খেতে শুরু করলো।

ততক্ষণে যানটি আকাশে ভেসে উঠেছে।

যানটি এত দ্রুত হাওয়ায় ভেসে উড়ে যাচ্ছিলো তাতে ভেতরে অবস্থান মনে হচ্ছিলো। যানটি স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে আছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা হীম সাগরের উপরে এসে পড়লো।

যানটির মধ্যে কিছুই বোঝা যাচ্ছিলো না, তবুও বনহুর চোখে বাইনোকুলার লাগিয়ে নিচের দিকে তাকিয়ে ছিলো।

রাণী বললো—মহাথরের গোপন অস্ত্রাগারটি ধ্বংস করা একান্ত দরকার মনে করছি।

হাঁ রাণী, তুমি যা ভাবছো আমিও ঠিক তাই ভাবছিলাম। মহাথরের আসল অস্ত্রগারটি রয়েই গেলো। তবে হাঁ, ওর অস্ত্র তৈরীর কারখানাগুলো বিনষ্ট করে দিয়ে তুমি ভালই করেছে। আমার উদ্দেশ্যও ছিলো একই। ওর মান্দান হোটেল ধ্বংস করা সহজ ছিলো না তাও তুমি সহজভাবে সমাধা করেছে। একটি প্রশ্ন তুমি কিভাবে মহাথরের কার্যকলাপের সন্ধান পেলে রাণী?

হাসলো রাণী, তারপর বললো—বিশ্বের সর্বত্র যেমন তোমার বিচরণ তেমনি আমারও আর সেটা তুমি জানো একটা কথা তোমাকে বলবো-বনহুর।

বলো?

জানতে পারলাম বাংলাদেশে এবার ভীষণ বন্যা যা মানুষের জীবনকে বিপন্ন করে দিয়েছে। মানুষ আর বন্যার পানিতে লড়াই চলেছে, হাজার হাজার মানুষ এবং গৃহপালিত পশু প্রাণ হারাচ্ছে–

তোমার কথা মিথ্যা নয়। আমার কাছেও পৌঁছেছে এ সংবাদ।

বাংলাদেশ আমাকেও হাত দিয়ে ডাকছে।

তাহলে চলো আমরা দুজন যাই বাংলাদেশে। নূরকে ওর মায়ের কাছে পৌঁছে দিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে।

তোমার আহাদ চৌধুরী যদি বারণ করেন?

জানি না তিনি বারণ করবেন বা করতেন না, তবে তিনি এখন এদেশে নেই।

বিশেষ কোনো কারণে তিনি দূরদেশে গেছেন, ফিরতে কিছুদিন বিলম্ব হবে। সঙ্গে সঙ্গে সমীরকুমার। আর সেজন্যেই আমি নিশ্চিন্ত, আমার দু'জন অনুচর অজ্ঞাতে তাদের সঙ্গে সদা প্রহরায়।

হেসে বললো বনহুর–বিশ্বখ্যাত ডিটেকটিভ আহাদ চৌধুরীর সঙ্গে দেহরক্ষী লাগবে?

প্রকাশ্য নয় অজ্ঞাতে তারা তাদের অনুসরণ করবে এবং ওয়ারলেসে প্রতিদিনের সংবাদ আমার আস্তানায় পৌঁছে দেবে।

অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো বনহুর।

রাণী বললো হাসলে কেনো বনহুর?

দস্যুরাণী হয়েও তোমার মনের আর একটা রূপ লক্ষ করে। যাক ওসব কথা, তুমি এখন কোথায় আমাদের নামাতে চাও?

কেন আমার আস্তানায়।

নূর যে আসনে শায়িত ছিলো সেই স্থান হতে বনহুর ও রাণীর কথাবার্তা শুনতে পাচ্ছিলো। নীলাভ আলোর বন্যায় কথাগুলো ভেসে চলে যাচ্ছিলো যানের বাইরে।

নূর নিশ্চিন্তে দু'চোখ বন্ধ করে শয্যায় পড়ে রইল। উড়ন্ত শশার এই যানটির নাম, বিস্ময়কর বটে। নূর, রাণী ও পিতা বনহুরের মুখে কিছু পূর্বে এই যানটির নাম বারকয়েক শুনেছে। রাণী নিশ্চয়ই কোন শক্তিশালী মহিলা, যার কার্যকলাপ এবং বুদ্ধিবল যে কোনো নারীর চেয়ে অনেক বেশি। নূরকে যখন রাণী ফলের রস পান করাচ্ছিলো তখন অনাবিল একটা শান্তি তার নির্যাতিত দেহ-মনকে সতেজ করে তুলছিলো। শয্যাটি আজ তার কাছে কোমল নরম তুলতুলে মনে হচ্ছিলো। কিছুক্ষণের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ে নূর।

হীম সাগরের হীমল পরশ তার সমস্ত শরীরে কোমল পরশ বুলিয়ে দেয়।

*

চোখ মেলতেই নূর অবাক হলো। কোথায় সেই উড়ন্ত শশার বা নীলাভ যানটি, যার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছিলো। এ যে তার শয়ন কক্ষ, চোখ মেলতেই মা মনিরার কণ্ঠস্বরনূর! নূর কোথায় গিয়েছিলে বাবা? আম্মু-শব্দটা করে মায়ের কোলে মুখ লুকালো নূর। কত দিন, কত সাধনার পর যেন সে মাকে ফিরে পেলো।

মাথার চুলে হাত বুলিয়ে মনিরা বললোর কি হয়েছিস তুই? সমস্ত দেহে আঘাতের চিহ্ন। কে তোর এই অবস্থা করেছে নূর?

আম্মু জানি না কে তারা, তবে তোমার গাড়ির ড্রাইভার আমাকে ধোঁকা দিয়ে নিয়ে গিয়েছিলো। সে অনেক কথা আম্মু

থাক আমি পরে শুনবো। তুই সুস্থ হয়ে ওঠ বাবা। ডাক্তার এসেছিলেন তিনি বললেন কোনো শয়তান লোক চক্রান্ত করে তোমার এ অবস্থা করেছে। নূর তুই দুর্বল তাই কথা বলতে বারণ করেছে। আমি আরমানের কাছে ফোন করেছি সে এলো বলে।

আব্বু আর তোমরা আমাকে যতখানি দুর্বল বা কাহিল মনে করেছো আসলে ততখানি দুর্বল নই, তবে হ্যাঁ ছিলাম দুর্বল।

একটু ঘুমা বাবা।

মা মা, আমি শুনতে চাই আমি কি করে আমার বাংলোয় ফিরে এলাম। বলো আম্মু বড় জানতে ইচ্ছে করছে।

জানিনা নূর।

জানো না?

না।

তবে তুমি এলে কেমন করে?

কে যেন টেলিফোনে জানালো, এক্ষুণি যেন চলে আসি, নূর ফিরে এসেছে সে ভীষণ অসুস্থ

আম্মু, সে কণ্ঠস্বর নারী না পুরুষের ছিলো?

নারী কণ্ঠ তবে সাধারণ মেয়ের কণ্ঠ বলে মনে হল না। কিন্তু তখন কণ্ঠস্বর নিয়ে ভাববার সময় ছিলো না। তাড়াতাড়ী গাড়ি বের করতে বললাম ড্রাইভারকে

হাঁ নূর, ড্রাইভার গ্যারেজ থেকে গাড়ি বের করে আনতেই রওয়ানা দিলাম। এসে দেখলাম বিছানায় সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়ে রয়েছিস তুই। আশপাশে কেউ নেই। শুধু দারোয়ান গেটে পাহারা দিচ্ছিলো। বেশ কয়েকদিন হলো তুই নিরুদ্দেশ হয়েছিস। কোথায় গিয়েছিস কেউ জানে না–সেই হতে পুলিশ মহল তোকে খুঁজে

বেড়াচ্ছে। পত্র-পত্রিকায় অনেক লেখালেখি হয়েছে। সমস্ত শহরে একটা গভীর দুঃখ ভরা পরিবেশ ছড়িয়ে পড়েছে। এমন কি জনসাধারণ ও তোর সন্ধান করছে। বৃদ্ধ সরকার সাহেব অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তুই। কোথায় গিয়েছিলি নূর?

এমন সময় সরকার সাহেব ও আরমান কক্ষমধ্যে প্রবেশ করলো।

তাদের চোখেমুখে বিস্ময় এবং খুশির উচ্ছ্বাস ফুটে উঠেছে। আরমান নূরের পাশে বসে তাকে জড়িয়ে ধরে নূর তুমি এতদিন কোথায় ছিলে? কে তোমার এই অবস্থা করেছে? নিশ্চয়ই কোনো দুষ্ট লোকের পাল্লায় পড়েছিলে?

নূর কিছুটা সোজা হয়ে বসার চেষ্টা করে বললো–হ, তোমার অনুমান সত্য।

আরমান বললো—-শুয়ে শুয়ে কথা বলো। এ কদিন যা চিন্তায় ছিলাম। বিশেষ করে আম্মু ভীষণ ব্যস্ত হয়ে কান্নাকাটি করতে না পেরে হন্যে হয়ে তোমাকে খুঁজে বেড়িয়েছেন। সত্যি কি হয়েছিলো বলবে?

প্রথম থেকেই বলি, সেদিন অফিসের কাজে বের হবো। বেরুনের পূর্বে সেদিনেই পেপার খানা দেখছিলাম। হঠাৎ আম্মুর ড্রাইভার এসে জানালো আম্মু ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, তাকে হসৃপিটালে নেওয়া হয়েছে। কথাটা শোনা মাত্র আমি ঘাবড়ে গেলাম। হঠাৎ আম্মু অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, আমাকে কিছু না জানিয়ে তাকে হসপিটালে ভর্তি করা হয়েছে—-কিন্তু বেশি কিছু ভাববার সময় হলোনা–

বিস্ময় নিয়ে শুনছিলো মনিরা, তার অসুখকবে কখন তার অসুখ হয়েছিলো, সব মিথ্যা কথা। বললো মনিরা।

নূর বলেই চলেছ, হসপিটালে ড্রাইভার আমাকে নামিয়ে দিলো। বললো আরমান অবাক হয়ে–তারপর?

হসপিটালে তাড়াতাড়ি প্রবেশ করে আম্মার বেডের সন্ধান করতে লাগলাম। কিন্তু আম্মুর কোন খোঁজ পেলাম না। একজন ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করলাম আম্মুর নাম ঠিকানা সব বললাম, তিনি বললেন, না তো এমন কোন রোগী এই নাম ও ঠিকানায় ভর্তি করা হয়নি। আমি বেরিয়ে আসবো এমন সময় একজন ডাক্তার বললেন–আসুন আমার রুমে, কথা আছে আপনার সঙ্গে। আমার মনের অবস্থা তখন ভালো ছিলো না, আমি ডাক্তারের সঙ্গে তার রুমে প্রবেশ করলাম। ডাক্তার বললেন–ঘাবড়ে গেছেন আপনি তা সত্যি মায়ের অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে

কোন সন্তান চুপ থাকতে পারে বলুন? অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন তিনি কিন্তু এখন সুস্থ। তাকে হসপিটালে নেওয়ার কোন দরকার হয়নি। আপনি টেলিফোনে জেনে নিতে পারেন তিনি এখন কেমন আছেন। ভুল বুঝতে পারলাম, টেলিফোনে কেন মায়ের অসুস্থতার কথা জেনে না নিয়ে এসেছি। ডাক্তার যা বললেন সত্য, টেলিফোন করে জানি-নি আম্মু...

এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে যাচ্ছে নূর।

এমন সময় পুরোন চাকর বশির চাচা গরম দুধ এনে দাঁড়ালো।

মনিরা ছোট্ট ট্রেটার ওপর থেকে গরম দুধের গ্লাসটা তুলে নিয়ে নূরের মুখে ধরেনূর আগে গরম দুধটুকু খেয়ে নাও।

নূর বিনা আপত্তিতে দুধ পান করলো, তারপর গ্লাসটা মায়ের হাতে দিলো।

মনিরা অন্য গ্লাসটা বশির চাচার হাতের ট্রের উপরে রাখলো।

বশির চাচা গ্লাসসহ ট্রেটা নিয়ে চলে গেলো।

নূর হাতের পিটে মুখটা মুছে ফেলে আবার সে বলতে শুরু করলো- টেলিফোনের রিসিভার হাতে নিয়ে মুখে ধরতেই একটা গন্ধ আমার নাকে প্রবেশ করলো, মনে আছে সঙ্গে সঙ্গে হাতখানা আমার শিথীল হয়ে এলো, রিসিভার খসে পড়লো হাত থেকে...তারপর আর কিছু মনে নেই।

তারপর! তারপর কি হলো? মনিরা ব্যাকুল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলো।

আরমান এবং সরকার সাহেব স্তব্ধ হয়ে শুনছিলো।

নূর বললো—তারপর যখন আমি সংজ্ঞা ফিরে পেলাম তখন দেখলাম আধো অন্ধকার কঠিন পাথুরে মেঝেতে আমি পড়ে আছি। চোখ মেলতেই ভীষণ কণ্ঠস্বর কানে এলো, হাতের মুঠায় পেয়েছি আর বেরুতে পারবে না। তোমার রক্ত আমরা শুষে নেবো, হাঃ হাঃ হাঃ করে সেকি নির্মম হাসির আওয়াজ। আমি বুঝতে পারলাম মায়ের অসুখ এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। আমাকে আটক করার এটা একটা কৌশল। বন্দী অবস্থায় তবুও অনাবিল শান্তি পেলাম আমার আম্মু তা হলে সুস্থ

আছেন। তারপর যে ঘটনাগুলো ঘটেছিলো সব বলে চললো তবে বনহুরের কথা সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে বললো নূর।

সবকিছু শোনার পর বললো আরমান—কে সে নরপশু যে তোমাকে কৌশলে আটক করে এভাবে নির্যাতন চালিয়ে হত্যা করতে চেয়েছিলো। যদি সেই মহান ব্যক্তিদ্বয় ঠিক সময়মত না গিয়ে পৌঁছতো তাহলে আর তোমাকে আমরা ফিরে পেতাম না।

মনিরা আঁচলে চোখ মুছে বললো—জানি না সেই মহান ব্যক্তিদ্বয় কে। আমার মনে হয় আল্লাহতায়ালার পাঠানো দূত তারা।

কিন্তু আশ্চর্য, কিভাবে তারা নূরকে এখানে রেখে গেলো। ঠিক তারই বাংলোর বিছানায়! কথাটা বললেন বৃদ্ধ সরকার সাহেব।

নূর তাকালো মায়ের মুখের দিকে। মায়ের মুখে তেমন কোনো বিস্ময় পরিলক্ষিত হলো না।

আরমান বললো হাঁ, এ কথা সত্য তারা কিভাবে নূরকে এখানে এনেছে এবং তাকে তার শয্যায় শুইয়ে দিয়েছে অত্যন্ত বিস্ময়কর বটে।

সরকার সাহেব বললেন-নূরের যে অবস্থা তাতে এখন তাকে ডাক্তার দেখানো দরকার। এ ছাড়া পুলিশমহলে এখনও সংবাদটা দেওয়া হয়নি।

আরমান বললোসরকার চাচা, পুলিশমহলে সংবাদটা পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে ওরা সবাই নূরকে দেখতে আসবেন এবং রিপোর্টার-সাংবাদিকরাও ভীড় জমাবে, তাতে নূরের বিশ্রামে ব্যাঘাত ঘটবে।

কিন্তু না জানালে যে দোষণীয় হবে বাবা! বললেন সরকার সাহেব।

এমন সময় দারোয়ান ব্যস্তসমস্ত হয়ে ছুটে এলো–সর্বনাশ হয়েছে ছোট সাহেব। সর্বনাশ হয়েছে…

নূর বললো—কি হয়েছে দারোয়ান?

দারোয়ান বললো—মা জ্বীর গাড়ির ড্রাইভার খুন হয়েছে।

ড্রাইভার খুন হয়েছে…অস্ফুট কণ্ঠে উচ্চারণ করলো নূর।

আরমান এবং সরকার সাহেবও থ’ হয়ে গেছেন।

মনিরা বললো–সেকি! ড্রাইভার তো গাড়িতেই ছিলো।

আরমান বললো—-নূর, নিশ্চয়ই এর পেছনে গভীর রহস্য লুকিয়ে আছে।

হাঁ আরমান, এ কথা সত্য। এতক্ষণ ড্রাইভারকে যদি ডাকতাম সেদিন সে কেন আমাকে মিথ্যা কথা বলে বাংলো থেকে বের করে নিয়ে গিয়েছিলো, কার চক্রান্তে সে এ কাজ করেছিলো–এসব যদি জেনে নিতাম। কিন্তু তা আর শোনা হলো না।

সবাই ব্যস্তসমস্ত হয়ে ছুটলো নিচে। নুরও নেমে গেলো।

অবাক হলো সকলে, ড্রাইভ আসনে বসে আছে ড্রাইভার, তার মাথাটা গাড়ির হ্যান্ডেলের ওপর কাৎ হয়ে পড়ে আছে, পাঁজরে গুলীবিদ্ধ হয়েছে। তাজা রক্ত গড়িয়ে পড়ছে পাদানির ওপর।

সবাই যখন ঘিরে দাঁড়িয়ে দেখছে তখন বশির চাচা নীরবে সরে গেলো সিঁড়ি বেয়ে উপরের দিকে।

বললো আরমান–শব্দহীন রিভলভার দ্বারা হত্যা করা হয়েছে।

সরকার সাহেব কান্নাজড়িত কণ্ঠে বললেন–এমন নির্দয় কে ছিলো যার হৃদয়ে এতটুকু দয়ামায়া নেই। বেচারী নিরীহ লোকছিলো…

মনিরা তাকালো নূরের মুখের দিকে।

নূর তখন অন্যমনস্কভাবে কিছু চিন্তা করছিলো।

এক সময় এক এক রকম উক্তি করছে। ড্রাইভারের হত্যা ব্যাপারটা ক্রমান্বয়ে আরও জটিল আকার ধারণ করতে লাগলো। আরমান বললো–নূর, পুলিশে ফোন করা দরকার।

নূর বললো–যাও, পুলিশ অফিসে ফোন করো।

আরমান তাড়াতাড়ি চলে গেলো ওপরে।

গিয়ে দেখলোবশির চাচা রিসিভার রাখলো, আরমানকে দেখে বললো—পুলিশ। অফিসে ফোন করেছি..রিসিভার রেখে চলে গেলো সে ওদিকে।

*

কিছুক্ষণের মধ্যেই পুলিশপ্রধান মিঃ আহমদ এলেন তার দলবল নিয়ে। নূরুজ্জামান ফিরে এসেছে এবং তার বাড়িতে তারই মায়ের গাড়ির ড্রাইভার খুন হয়েছে। ঘটনা ভীষণ রহস্যময়, জটিল।

মিঃ আহমদ এবং অন্যান্য পুলিশ কর্মকর্তা প্রথমে ড্রাইভারের হত্যার ঘটনাস্থলে গিয়ে ব্যাপারটা তদন্ত করলেন, তারপর লাশ মর্গে পাঠিয়ে নূরসহ উপরে হলঘরে এসে বসলেন। সমস্ত ঘটনা নূরের মুখে শুনলেন এবং ডায়রী করে নিলেন। মিঃ আহমদ নূরের মুখে সব শোনার পর গম্ভীরভাবে বললেন—-মিঃ জামান, আপনাকে যারা অপহরণ করেছিলো তাদেরই চক্রান্তে ড্রাইভার খুন হয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে বিস্ময়কর ব্যাপার, প্রকাশ্যে এভাবে তাকে কে খুন করে নির্বিঘ্নে পালিয়ে গেলো।

পাহারাদারটিকে ডাকা হলো, তাকে জিজ্ঞাসা করলেন মিঃ আহমদ-তুমি কি কাউকে প্রবেশ করতে দেখেছিলে?

না স্যার, আমি গেটেই বসেছিলাম, কেউ ভেতরে প্রবেশ করেনি। বললো পাহারাদার।

মিঃ আহমদ পুনরায় প্রশ্ন করলেন–তুমি কখন জানতে পারলে ড্রাইভার খুন হয়েছে?

আমার পানির পিপাসা পাওয়ায় এদিকে আসছিলাম স্যার, হঠাৎ চোখ চলে গেলো গাড়ির দিকে, চমকে উঠলাম দেখলাম গাড়ির হ্যাঁভেলের ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে আছে ড্রাইভার। কাছে এসে আমার চক্ষুস্থির হলো, দেখলাম ড্রাইভারের পাঁজর বেয়ে তাজা রক্ত ঝরে পড়ছে। তখনই ছুটে উপরে গেলাম, সংবাদটা জানালাম স্যারকে। পাহারাদার যখন সব কথা বলছিলো তখন বশির কয়েক কাপ চা এনে রাখলো মিঃ আহমদ এবং তার সঙ্গীদের সামনে।

নূর বললো–বশির চাচা, কিছু নাস্তা আনো, শুধু চা দিলে।

বশির মাথা কাৎ করে বললো—আচ্ছা।

মিঃ আহমদ বললেন–না, আমরা চা ছাড়া কিছু খাবো না। চা-ই যথেষ্ট।

বশির চলে গেলো।

মিঃ আহমদ চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বললেন-মিঃ জামান, নিশ্চয়ই সেই দুস্কৃতিকারীর সহচরগণ কৌশলে প্রবেশ করে মিসেস মনিরার গাড়ির ড্রাইভারকে হত্যা করে সবার অগোচরে পালিয়ে গেছে। ড্রাইভার জীবিত থাকলে তার সব গোপন রহস্য উদঘাটন হয়ে পড়তো। তবে যারা আপনাকে সেই যমপুরী থেকে উদ্ধার করে এনেছে তারা মহাথরকে রেহাই দেবে না এটাও সত্য। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য আপনার বাংলোয় আপনার সংজ্ঞাহীন দেহটা কি করে বহন করে এনে ঠিক আপনারই শয্যায় শয়ন করিয়ে রেখে গেছে অথচ কেউ জানে না কোন পথে তারা প্রবেশ করেছিলো এবং কোন পথে বেরিয়ে গেলো।

মনিরাকে লক্ষ্য করে বললেন এবার মিঃ আহমদ-আপনাকে কে বা কারা টেলিফোন করেছিলো? সে কণ্ঠস্বর কি আপনার পরিচিত মনে হয়েছে মিসেস মনিরা?

মনিরা এতক্ষণ সব কথা নিশ্চুপ শুনে যাচ্ছিলো, এবার সে বললো–না, সে কণ্ঠস্বর আমার পরিচিত নয়। আমাকে যে টেলিফোন করে বলেছিলো সে মহিলা।

মিঃ আহমদ অস্পষ্ট কণ্ঠে বললেন–মহিলা। মিঃ নূরুজ্জামান, আপনাকে যে দুজন উদ্ধার করেছিলো তাদের মধ্যে কি কেউ মহিলা ছিলো।

মনে হয় ছিলো, তবে দুজনের দেহেই ছিলো পুরুষের পোশাক। তখন আমার অবস্থা বুঝতেই পারছেন বড় কাহিল ছিলো, তাই উদ্ধারকারীদের আমি ভালভাবে লক্ষ করতে পারিনি।

তাহলে বোঝা যাচ্ছে উদ্ধারকারীদ্বয়ের মধ্যে একজন মহিলা ছিলো। কিন্তু প্রশ্ন জাগছে মনে, তারা মহাথরের সেই গোপন গুহায় কি কারণে গিয়েছিলো?

অপর এক পুলিশ কর্মকর্তা বললেন–স্যার, এমনও হতে পারে তারা মিঃ জামানকে উদ্ধার করতেই সেখানে গিয়েছিলো।

হাঁ সেটাও হতে পারে, তবে তারা কারা? বললেন–আহমদ সাহেব। জোড়া তার ভ্রুকুঞ্চিত হলো।

আরমান বললো—স্যার, তারা যারাই হোক আর নারী অথবা পুরুষই হোক ওরা মহান মহৎ ব্যক্তি। তারা যদি ঠিক সময়মত না গিয়ে পৌঁছতো তাহলে বন্ধু নূরকে আমরা চিরদিনের জন্য হারাতাম।

মনিরা ঐ সময় উঠে কক্ষে প্রবেশ করলো।

গিয়েই চমকে উঠলো মনিরা, বশির নূরের নোটবুক হাতে নিয়ে কিছু লিখছে। মনিরা দেখামাত্র রাগান্বিতভাবে বশিরকে কিছু বলতে যাচ্ছিলো, সঙ্গে সঙ্গে বশির মনিরার মুখে হাতচাপা দিলো।

মনিরা আরও ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলো এবং বশিরের হাতখানা সজোরে সরিয়ে দিয়ে বললো এত সাহস তোমার…আমার গায়ে হাত দাও…এ…ত…

বশির ঠোঁটের উপর আংগুল রেখে বললো—চুপ করো মনিরা!

মনিরার দু’চোখে বিস্ময় ফুটে উঠলো, বললো—তুমি! মনির, তুমি…

া মনিরা, প্রয়োজন ছিলো তাই…

তাহলে বশির কোথায়?

বশিরকে আমি সরিয়ে রেখেছি, ঠিক সময়মত এসে যাবে।

কিন্তু…

মনিরা, তোমার ড্রাইভারকে আমিই খুন করেছি।

তুমি তাকে খুন করেছ?

হাঁ মনিরা।

এত হৃদয়হীন তুমি!

যে কাজ সে টাকার লোভে করেছে তা তুমি বুঝতেই পারছো। নূরকে সে টাকার লোভে দুস্কৃতিকারীদের হাতে তুলে দিয়েছে, তাকে আর কোনোদিন তুমি পেতে না মনিরা। ঐ ড্রাইভারের চক্রান্তে তুমি নূরকে হারাতে বসেছিলে।

আমি কিছুটা অনুমান করেছিলাম, তবে বুঝতে বিলম্ব হয়েছে আমার। নূরের মুখে সব শোনার পর আমি ড্রাইভারের কাছে জিজ্ঞাসা করতাম, আমার কোনো কিছু হয়নি অথচ আমার অসুস্থতার কথা বলে মিথ্যা ধোকা দিয়ে কেন নূরকে তার বাংলো থেকে বের করে নিয়ে গিয়েছিলো...কে তাকে প্রলুব্ধ করেছিলো... কিন্তু তুমি সে সুযোগ দিলে না।

সব আমিই চুকিয়ে দিয়েছি মনিরা। যে ব্যক্তি টাকার মোহে এতবড় অপরাধ করতে পারে তাকে এক মুহূর্ত জীবিত রাখা বাঞ্ছনীয় নয়।

এমন সময় নূর প্রবেশ করে। পেছনে দাঁড়িয়ে বশির এবং মায়ের সব কথা শোনে নূর। বুঝতে পারে বশির বেশে যাকে সে দেখতে পাচ্ছে আসলে সে বশির নয়, তারই আব্বু বনহুর।

হেসে বললো নুর-আম্মু, তুমি কার সঙ্গে কথা বলছো।

বশির বেশী বনহুর বললো—আমার সঙ্গে। নূর, তোমাদের বশির চাচাকে আমি সরিয়ে রেখেছি। আমি গেলেই সে চলে আসবে। কিভাবে তুমি কাজে অগ্রসর হবে তোমার নোটবুকে লেখা রইলো। মিঃ আহমদ কি চলে গেছেন?

হাঁ আব্বু, ওনারা বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। আব্বু তুমি ঠিক সময়মত পৌঁছতে পেরেছিলে বলেই আমি বেঁচে গেলাম। তুমি কি এক্ষুণি চলে যাবে?

যেতে হচ্ছে কারণ মহাথরের মৃত্যু ঘটেনি। সে জীবিত আছে।

বলো কি আব্বু!

হাঁ নূর। তাকে সায়েস্তা করতে না পারলে আবারও সে তোমার ওপর আক্রমণ চালাতে পারে। তার একটি চোখ নষ্ট হয়ে গেছে, কিছুদিন সে বাইরে বেরুতে পারবে না। আমার ওপরে তার আক্রোশ আছে, ভীষণ আক্রোশ এবং সেই

প্রতিশোধ নেয়ার জন্য সে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবে। নোটবুকে সংক্ষিপ্তভাবে তোমার কাজের নির্দেশ দিয়ে গেলাম। কথাটা বলে বনহুর বেরিয়ে গেলো।

*

দরবারকক্ষে একটি সুউচ্চ আসনে বসে বনহুর তার অনুচরগণকে ডেকে বললো তোমাদের কোনো অসুবিধা হচ্ছে না জানি। কারণ রহমান তোমাদের ঠিকভাবেই পরিচালনা করেছে। আমি সবকিছু তারই মুখে শুনলাম। বনহুর ডাকলোকাসেম!

কুর্ণিশ জানিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো কাসেম।

বনহুর বললো–মন্থনা দ্বীপে সাহায্য দেবার জন্য তোমার ওপর নির্দেশ দেওয়া হয়েছিলো ঠিকমত সাহায্যদ্রব্য বিতরণ হয়েছে তো?

হাঁ সর্দার, প্রতিটি বাড়িতে আমি ও আমার সহকারী টাকা-পয়সা এবং খাদ্যদ্রব্য বিতরণ। করেছি। মন্থনাদ্বীপের অধিবাসীরা এখন বেশ ভাল আছে।

রণজিৎ তুমি রায়হান বন্দরে যে জাহাজটিতে পাঁচ কোটি টাকা মূল্যের মালামাল আটক। করেছিলে সে মাল কিভাবে দুঃস্থ মানুষের মধ্যে বণ্টন করেছে।

সর্দার, আপনি চলে যাওয়ার সেই আটক জাহাজটি আমি আমার দলবলসহ নাদান দ্বীপে নিয়ে যাই এবং সেখানকার অসহায় নিগ্রোদের মধ্যে বিলিয়ে দেই। নীল সাগরে কিছু মালসহ জাহাজখানা আমরা তলিয়ে দিয়েছি।

রহমান, একাজ কি ভাল করেছো তোমরা? বললো বনহুর।

রহমান বললো—সর্দার, পুলিশমহল জানাজানি হবার সম্ভাবনা দেখা দিলে আমরা তাড়াহুড়া করে কিছু মালসহ জাহাজখানা নীল সাগরে ডুবিয়ে দিয়েছি।

এছাড়া কি অন্য কোনো পথ ছিলো না?

না সর্দার, আমরা অনেক ভেবেই এ কাজ করেছি। মালামালসহ জাহাজখানা আমরা আটক করার পর যখন নাদানদ্বীপ অভিমুখে নিয়ে যাই তখন জাহাজের মালিক জানতে পেরে পুলিশের সাহায্য চায়। আমরা তাড়াহুড়া করে মালামাল

দুঃস্থ অসহায় ক্ষুধাতুর নিগ্রোদের মধ্যে বিলিয়ে দেই, তারপর জাহাজখানা কিছু মালসহ সকলের অজ্ঞাতে নীলসাগরে এনে তলিয়ে দিয়েছি।

কিন্তু কিছু মালসহ তোমরা জাহাজখানা তলিয়ে দিলে, ওগুলো সরিয়ে রাখলে তো অপর এক স্থানে দুঃস্থ মানুষদেরকে দিতে পারতে

ৎসে সুযোগ আসেনি বলেই আমরা এ কাজ করেছি। বললো এবার রণজিৎ।

রহমান বললো—সর্দার, শুনতে পাচ্ছি মন্থনা দ্বীপ এবং আরকান দ্বীপ যেভাবে বন্যাপ্লাবিত হয়েছে সেইভাবে বাংলাদেশও বন্যায় ভেসে যাচ্ছে।

হাঁ শুনেছি। বাংলাদেশে রাণী যাবে। তার ইচ্ছা একবার স্বচক্ষে দেখবে সে বাংলাদেশের বন্যাপ্লবিত অঞ্চলগুলো। আমাকেও যেতে হবে বাংলাদেশে, রহমান তুমিও যাবে আমার সঙ্গে।

আপনার কথামতই নির্দেশ পালন করবো সর্দার। তবে মনে হয় আমি না গেলেই শ্রেয় হবে, কারণ সেই শয়তান মহাথর আহত অবস্থায় ভেগেছে, সে নিশ্চুপ থাকবে না। সর্দার আপনার কাছে সব শোনার পর যা মনে করছি তা হয়তো সত্য হতে পারে। সে যখন দুঃসাহস নিয়ে তাজের গলায় চিঠি লটকিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিলো, তার পুনঃপ্রবেশেরও সাহস হবে। তাছাড়া নূর এখনও সম্পূর্ণ সুস্থ নয়…

বললো বনহুর রহমান, তুমি যা বলেছে সত্য। মহাথর আহত অবস্থায় আরও হিংস্র হয়ে উঠেছে। হয়তো সে এখন কোথাও আত্মগোপন করে তার আহত চক্ষুর চিকিৎসা চালাচ্ছে। আমি চেয়েছিলাম ওর দুটো চোখকেই বিনষ্ট করে দিতে।

সেদিন বেশীক্ষণ দরবার চললো না।

দরবারকক্ষ থেকে বেরিয়ে এলো বনহুর।

নূরী তার অপেক্ষা করছিলো। বনহুর বিশ্রামকক্ষে প্রবেশ করতেই নূরী পাশে এসে দাঁড়ালো। বনহুরের মুখের দিকে তাকিয়ে বললো নূরী–শুনলাম তুমি বাংলাদেশে যাচ্ছো?

হাঁ নূরী। বাংলাদেশের বুকে নেমে এসেছে এক ভয়ংকর প্লাবন। বাংলাদেশের শহর বস্তি এলাকা এবং পল্লী অঞ্চলগুলো আজ গভীর পানির নিচে। সেখানের মানুষগুলো ঘরের চালে, গাছের ডালে এমনকি অনেকেই পানিতে কলাগাছের ভেলায় জীবন রক্ষার্থে আশ্রয় নিয়েছে। তাদের মুখে আহার নেই, আগুন জ্বালাবার শুকনো কাঠ নেই, নেই আলো, নেই কোন সম্বল। তাই একবার ওদের দেখতে মন চায়। শুনেছি বাংলাদেশ সরকার এবং বাংলাদেশের জনসাধারণ যথাসাধ্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এইসব অসহায় মানুষকে বাঁচানোর জন্য।

এত যখন হচ্ছে তখন তোমার না গেলেই কি নয়? বাংলাদেশ সরকার আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছেন বন্যাপ্লাবিত অঞ্চলগুলোর অসহায় মানুষগুলোকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য। সরকারকে সহায়তা করছে বাংলাদেশের জনগণ, তবুও তুমি ভাবছো তাদের নিয়ে।

তুমি বুঝবে না নূরী। একবার আমাকে যেতেই হবে সেখানে। রহমানকে বলেছি কিছু অর্থ আমার সঙ্গে দেবে সে, যা দিয়ে আমি বন্যাপ্লাবিত দুঃস্থ মানুষদের কিছু উপকার করতে পারি। নূরী...

বলো?

জানো এমন একজনকে সঙ্গী হিসেবে পাবো, যার দান অপরিসীম। বাংলাদেশের দুর্গত মানুষদের জন্য সে প্রচুর অর্থ নিয়ে যাবে যা দ্বারা কিছু উপকার হবে এই মানুষগুলোর।

কে সে? আমি জানি তুমি একা যাবে কিন্তু...

পরে বলবো তোমাকে।

জানি না তুমি এতদিন কোথায় ছিলে, কেমন ছিলে। তবুও মন বলতো তুমি ভাল আছো, ফিরে আসবে। হুর, তোমাকে বলছিলাম জাভেদ বড় খেয়ালী হয়েছে। প্রতি মুহূর্তে সে অশ্বপৃষ্ঠে চেপে যেখানে খুশি ইচ্ছামত ঘুরে বেড়ায়, কখন কোন্ বিপদ তাকে গ্রাস করবে কে জানে।

বনহুর নূরীর কথায় কোনো জবাব না দিয়ে বললো—ফুল্লরা কেমন আছে? কোথায় সে?

তোমার কি মন চায় ফুল্লরার খোঁজখবর নিতে? তোমার কি মন চায় ফুল্লরাকে দেখতে বললো নূরী। ||||||||| হেসে বললো বনহুর—-সময় পাই কোথায় বলোনূরী, জানি তোমরা আমার ওপর রাগ করো

জেনেও পারি না তোমাদের খুশি করতে।

নূরী কিছু বলতে যাচ্ছিলো–এমন সময় রহমান হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলো–সর্দার, জাভেদকে একদল পুলিশ গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাচ্ছে।

আশ্চর্য কণ্ঠে বললো বনহুর–জাভেদকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাচ্ছে।

হাঁ সর্দার।

কি অপরাধ ছিলো তার?

পুলিশের গাড়িকে সে আক্রমণ করেছিলো। কান্দাই জঙ্গলের পাশ দিয়ে একটি পুলিশ ভ্যান যাচ্ছিলো। জাভেদ তার অশ্ব নিয়ে ভ্যানটিকে আটক করে এবং আক্রমণ চালায়। পুলিশ বাহিনীর কাছে ছিলো আগ্নেয়াস্ত্র, তারা জাভেদকে অস্ত্র ধরে ঘিরে ফেলে এবং অস্ত্রের মুখে তাকে বন্দী করে। আমাদের লোক দূরে একটি গাছের উপর থেকে সব লক্ষ করে এবং সেই অশ্বপৃষ্ঠে ফিরে এসে সংবাদটা জানালো।

রহমানের কথা শেষ হতে না হতে বললো নূরী–শুনলে তুমি! জাভেদের কথা শুনলে? এখন সে পুলিশের কবলে, বলল কি করবে তুমি!

সেই মুহূর্তে ফুল্লরা ছুটে এসে বনহুরের পা দুহাতে চেপে ধরে কেঁদে ফেলে-সর্দার জাভেদকে বাঁচিয়ে নাও। জাভেদকে বাঁচিয়ে নাও…ওকে পুলিশ ধরে নিয়ে গিয়ে মেরে ফেলবে…সর্দার, তুমি তাকে উদ্ধার করো…

বনহুর ফুল্লরাকে তুলে দাঁড় করিয়ে ভালভাবে তাকালো তার মুখের দিকে। এতদিন তাকে এমনভাবে দেখেনি। আজ দেখলো ফুল্লরাকে নতুনরূপে। অনেক বড় হয়েছে ফুল্লরা, অনেক সুন্দর হয়েছে সে। ফুল্লরার চোখের পানি বনহুরকে বিচলিত করে তুললল। বনহুর নিজের হাতে মুছিয়ে দিলো ফুল্লরার চোখের পানি, তারপর বললো–রহমান, তাজকে অশ্বশালা হতে বের করে আনো।

রহমান বললো—আচ্ছা সর্দার। বলেই দ্রুত সে বেরিয়ে গেলো।

বনহুর তার ড্রেস পাল্টানোর জন্য পাশের গুহায় প্রবেশ করলো। জমকালো ড্রেস পরে বেরিয়ে এলো, কোমরের বেল্টে রিভলভার, অপর পাশে সূতীক্ষ্ণধার ছোরা। পায়ে হাঁটু অবধি ঢাকা ভারী বুট। মাথায় পাগড়ি। বললো সেনূরী, ব্যস্ত হওয়ার কিছু নেই। আমি জাভেদকে নিয়ে আসছি…

নূরী বা ফুল্লরা কিছু বলার পূর্বেই বেরিয়ে গেলো বনহুর।

বেরিয়ে এলো আস্তানার বাইরে।

নূরী আর ফুল্লরা শুনতে পেলো বনহুরের অশ্ব তাজের পদধ্বনি। কেমন যেন বুকটা কেঁপে উঠলো নূরীর। একদিকে জাভেদ অপর দিকে বনহুর, কোনো বিপদ না ঘটে বসে!

পুলিশ ভ্যান জাভেদকে বন্দী করে নিয়ে কান্দাই জঙ্গলের পাশ কেটে পাথুরিয়া পথ ধরে এগিয়ে যাচ্ছে।

ওদিকে বনহুর তার অশ্ব নিয়ে দ্রুতবেগে ছুটে আসছে। অনেক দিন পর তাজ তার প্রভুকে পিঠে পেয়ে উচ্ছল হয়ে উঠেছে। উল্কার মত ছুটছে সে।

বন-জঙ্গল ভেদ করে উঁচু-নীচু পথ বেয়ে এগুচ্ছে বনহুর।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বনহুর গাড়িখানার কাছাকাছি পৌঁছে গেলো।

পুলিশ ভ্যানের পুলিশরা দেখতে পেলো জমকালো পোশাক পরিহিত এক ব্যক্তি অশ্বপৃষ্ঠে এগিয়ে আসছে।

পুলিশ ভ্যানখানা আরও দ্রুত চালানোর জন্য পুলিশ ভ্যানের চালককে নির্দেশ দিলেন পুলিশ সুপার।

বনহুর আরও নিকটে পৌঁছে গেছে। সে রিভলভার উঁচু করে পুলিশ ভ্যানটার চাকা লক্ষ্য করে গুলী ছুঁড়লো। বনহুরের গুলী পুলিশ ভ্যানটির পেছনের চাকায় বিদ্ধ হলো। সঙ্গে সঙ্গে ভ্যানটি ঘুরপাক খেয়ে থেমে পড়লো।

বনহুর অশ্ব নিয়ে একেবারে নিকটে পৌঁছে গেছে। লাফিয়ে পড়লো সে পুলিশ ভ্যানটির ওপর এবং কৌশলে এক একজন পুলিশের হাত থেকে রাইফেল কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিতে লাগলো দূরে ঝোঁপঝাড়ের মধ্যে।

পুলিশ বাহিনীও রাইফেল থেকে বনহুরকে লক্ষ্য করে গুলী চুড়ছিলো। কিন্তু বনহুর ক্ষিপ্রতার সঙ্গে মাথা নীচু করে এবং সরে গিয়ে নিজকে রক্ষা করে নিচ্ছিলো। বনহুর সুকৌশলে প্রায় সকলেরই হাত থেকে আগ্নেয় অস্ত্র ছিনিয়ে নিলো এবং দ্রুতহস্তে দূরে নিক্ষেপ করতে লাগলো। কাউকে বনহুর আহত বা নিহত করলো না। পুলিশ বাহিনীর প্রায় সকলকেই বনহুর অস্ত্রশূন্য করে ফেললো। ইচ্ছা করলে বেশ কয়েকজনকে সে হত্যা করতে পারতো, কিন্তু কাউকেই কোনরূপ আঘাত করলো না। শারীরিক শক্তি এবং বুদ্ধি কৌশলে পুলিশদের সকলকে কাবু করে জাভেদকে মুক্ত করে নিলো। তারপর জাভেদসহ তাজের পিঠে উঠে পড়লো বনহুর।

উল্কাবেগে তাজ ছুটতে লাগলো।

ততক্ষণে পুলিশদল ঝোঁপঝাড় থেকে তাদের রাইফেলগুলো খুঁজে বের করে আনতে লাগলো।

পুলিশ সুপার হতভম্ব হয়ে পড়েছেন। কান্দাই আসার পূর্বে তিনি দস্যু বনহুর সম্বন্ধে অনেক কথা শুনেছেন। হঠাৎ আজ তিনি দলবল নিয়ে সেই বনহুরের কবলে পড়বেন ভাবতে পারেননি। তিনি বনহুরকে লক্ষ্য করে তার রিভলভার থেকে গুলীও ছুঁড়েছেন কিন্তু একটি গুলীও বনহুরের দেহে বিদ্ধ করতে পারেননি।

বনহুর যখন রিভলভারখানা সুকৌশলে তার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে দূরে নিক্ষেপ করলো তখন তিনি বনহুরের শক্তির কিছুটা পরিচয় পেয়েছিলেন। রিভলভারখানা পুলিশ যখন কুড়িয়ে তার হাতে এনে দিলো তখন পুলিশ সুপার যেন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিলেন। ভাবছিলেন বনহুর দস্যু হলেও মহৎ বটে, ইচ্ছা করলে সে দু'চারজন পুলিশকে নিহত বা আহত করতে পারতো কিন্তু সে তা করেনি, বরং তাকেই হত্যা করার জন্য পুলিশ আপ্রাণ চেষ্টা করেছে, তবুও তাকে ঘায়েল করতে পারেনি তারা।

পুলিশ সুপার এতগুলো পুলিশসহ পরাজিত হলো বনহুরের কাছে। শুধু দুঃখই জাগলো না মনে, ভীষণ ক্ষোভ হলো। বনহুরকে সায়েস্তা করতে না পারলে তার

স্বস্তি হবে না।

অন্যান্য পুলিশ যার যার অস্ত্র খুঁজে নিয়ে ফিরে এলো।

কিন্তু তারা শহরে ফিরে যাবে কি করে!

তাদের ভ্যানের চাকা বনহুর নষ্ট করে দিয়েছে। গাড়ি আর চলবে না।

পুলিশ সুপার ওয়্যারলেসে জানিয়ে দিলেন ঘটনাটা কান্দাই পুলিশ হেড কোয়াটারে। অপর একটি পুলিশ ভ্যানসহ কিছু পুলিশ যেন চলে আসে।

পুলিশপ্রধান সংবাদ পেয়ে নিজে ছুটলেন পুলিশভ্যানসহ। বেশ কিছুদিন তারা দস্যু বনহুর সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত ছিলেন। পুলিশ প্রধান যখন রওয়ানা দিলেন তখন বনহুর জাভেদসহ ফিরে এসেছে তাদের আস্তানায়।

নূরী সন্তানকে বুকে জড়িয়ে ধরলো-জাভেদ, তুই কেন পুলিশের পথ রোধ করতে। গেলি। কেন তুই পুলিশ বাহিনীর কাজে বাধা দিতে গিয়েছিলি?

জাভেদ নীরব।

সে শুধু মায়ের কোলে মাথা রেখে নিশ্চুপ পড়ে রইলো। ফুল্লরার আনন্দ ধরে না খুশিতে উচ্ছল সে। জাভেদ তার প্রাণপ্রিয়, তাকে সে অন্তর দিয়ে ভালবাসে। জাভেদ পুলিশের হাতে বন্দী হয়েছে কথাটা শোনায় ফুল্লরা ভীষণভাবে বিচলিত হয়ে পড়েছিলো এবং কান্নাকাটি শুরু করে দিয়েছিলো। বনহুর জাভেদকে নিয়ে ফিরে আসতেই ফুল্লরা ছুটে গিয়ে বনহুরের হাত দু’খানা মুঠায় চেপে ধরে বলেছিলোসর্দার, তুমি যদি এ সময় না থাকতে তাহলে জাভেদকে ওরা ধরে নিয়ে চলে যেতো। আর ওকে পেতাম না সর্দার। তুমি অনেক ভাল…তুমি অনেক ভাল…

বনহুর তখন ফুল্লরাকে লক্ষ করছিলো, একদিন নূরীর মধ্যেও সে দেখেছে এই আকুলতা। বনহুরকে একটু না দেখলে অস্থির হয়ে পড়তে সে। কোথায় যে ছুটে যেতে তার ঠিক ছিলো না। জঙ্গলে জঙ্গলে সন্ধান করে ফিরতে, কত জায়গায় সে হন্যে হয়ে খুঁজতে তাকে। ফিরে এলে আনন্দে আত্মহারা হতো সে। আঁপিয়ে পড়তো তার বুকে, খুশির উচ্ছ্বাসে ভরিয়ে দিতো নূরী বনহুরকে। সেই দিনগুলির

স্মৃতি ভেসে ওঠে বনহুরের মনের পর্দায়। ফুল্লরার মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে বনহুর।–

ফুল্লরা খুশিতে উচ্ছল হয়ে চলে যায়। তার পায়ের মল ঝুম ঝুম শব্দ করে মিলিয়ে যায় আস্তানার পাথুরিয়া দেয়ালের ওপরে।

জাভেদ বুঝতে পারে ফুল্লরা তার অপেক্ষা করছে। তাই জাভেদ বেরিয়ে আসে মায়ের কাছ থেকে।

হাসে বনহুর–সূরী, ফুল্লরা ওর প্রতীক্ষা করছে, যেতে দাও।

নূরী ফিরে তাকায় বনহুরের দিকে–তুমি তো কোনো আঘাত পাওনি?

না, তেমন কোনো আঘাত পাইনি নূরী! তবে পুলিশবাহিনী আমাকে ঘায়েল করার চেষ্টা করেছিলো কিন্তু বিফল হয়েছে। আমার উদ্দেশ্য ছিল শুধু জাভেদকে পুলিশের কবল থেকে উদ্ধার করা। আমি তা করতে পেরেছি নূরী। ইচ্ছা করলে সবগুলো পুলিশকে হত্যা করতে পারতাম কিন্তু আমি তাদের হত্যা করিনি।

সেজন্য তোমাকে ধন্যবাদ হুর। তোমার কবল থেকে পুলিশ বাহিনী যে অক্ষত অবস্থায় ফিরে গেছে এটা তাদের চরম সৌভাগ্য।

*

আলগোছে বনহুর শয্যা ত্যাগ করলো। পাশের টেবিল থেকে বাইনোকুলারখানা তুলে নিয়ে চোখে ধরে তাকালো গুহার গবাক্ষপথে-দূরে বহুদূরে কান্দাই পর্বতমালার দিকে। বেশ কিছুক্ষণ লক্ষ করে ফিরে এলো শয্যায়।

নূরী অঘোরে ঘুমাচ্ছে।

বনহুর হাতঘড়িটার দিকে তাকাচ্ছে বারবার।

অর্ধশায়িত অবস্থায় বনহুর গভীরভাবে ভাবছিলো। গুহার একপাশের দেয়ালে একটি মশাল নিভু নিভু অবস্থায় জ্বলছে। বনহুরের সুন্দর মুখখানা বেশ ভাবাপন্ন মনে হচ্ছে।

এমন সময় রহমান এসে দাঁড়ালো দরজার বাইরে।

ডাকলো রহমান-সর্দার।

বনহুর শয্যা থেকে নেমে এলো, রহমান ও তার সঙ্গে কায়েসকে দেখতে পেলো। কায়েসের কাঁধে একটি বড় ব্যাগ।

রহমান কুর্ণিশ জানিয়ে বললো–সর্দার, আপনার আদেশমত টাকা এনেছি।

তাজকে প্রস্তুত রাখো, আর এই ব্যাগ তাজের পিঠে বেঁধে দাও। কথাগুলো বললো বনহুর

আচ্ছা সর্দার। বলে রহমান ও কায়েস চলে গেলো।

বনহুর ফিরে এসে পুনরায় বাইনোকুলারখানা তুলে নিলো হাতে, তারপর গিয়ে দাঁড়ালো গুহার উন্মুক্ত গবাক্ষে। গভীরভাবে কিছু লক্ষ্য করছে সে।

এমন সময় নূরী তার পেছনে এসে দাঁড়ালো, বিস্ময় নিয়ে বললো, আমি লক্ষ করেছি বারবার তুমি ঐ গবাক্ষে এসে কিছু দেখবার চেষ্টা করছে। কি দেখছো বলো তোর

বনহুর বললো–নূরী, তোমাকে বলেছিলাম বাংলাদেশে বন্যা দুর্গতদের দেখতে যাব।

নূরী বললো—ঐ পর্বতমালার উপরে কি বাংলাদেশ?

তাহলে তো বন্যায় ডুবতো না নূরী। তাছাড়া আমি নিজেই ছিলাম, যতটুকু পারি আল্লাহর মেহেরবানিতে তাদের সহযোগিতা করতে পারতাম। বাংলাদেশ বহুদূরে, এখানে যখন রাতের অন্ধকার তখন সে-দেশ সূর্যের আলোয় ঝলমল, মানে দিন, বুঝলে?

হা বুঝেছি। তবে ওখানে কি লক্ষ করছো?

লক্ষ করছি আমি যে যানটিতে যাবো সেটা এলো কিনা।

তোমাকে কেউ উদ্বুদ্ধ করেছে বাংলাদেশে যাওয়ার জন্য, তাই না?

শুধু তাই নয়, আমার কর্তব্যও আছে, যাওয়াটা একান্ত দরকার নূরী। সমস্ত পৃথিবীর মানুষ আমার আপনজন তা তো তুমি জানো। আমি যদি সংবাদটা জেনেও কিছু না করতে পারি তাহলে আমার বড় খারাপ লাগবে। কথাটা বলেই একটু অন্যমনস্ক হয়ে যায় বনহুর, তার দৃষ্টি চলে যায় দূরে সেই কান্দাই পর্বতমালার ওপরে।

নূরীও লক্ষ করে চক্রাকারে একটি নীলাভ আলোকছটা কান্দাই পর্বতমালার উপরিভাগে ঘুরপাক খাচ্ছে।

বনহুর বললো–ঐ দেখো নূরী, ঐ অদ্ভুত যানটি আমাকে নিতে এসেছে। ঐ যানটিতে আমি বাংলাদেশে যাবো। বিদায় দাও নূরী?

তুমি কতদিন পর এলে…

লক্ষীটি বাধা দিও না।

যাও।

তুমি অভিমান করলে না তো?

না।

তবে চলি, কেমন?

বনহুর তার জমকালো ড্রেস পরে বেরিয়ে গেলো।

নূরী উন্মুক্ত গবাক্ষপথে তাকিয়ে রইলো সেই বিস্ময়কর যানটির দিকে। একটু পরই শুনতে পেলো তাজের পদশব্দ। অশ্বখুরের প্রতিধ্বনি সমস্ত কান্দাই জঙ্গল প্রকম্পিত করে তুললো।

নূরীর গন্ড বেয়ে দু'ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে এলো।

সে তখনও তাকিয়ে আছে সেই বিস্ময়কর যানটির দিকে। এখনও সেটা কান্দাই পর্বতের মাথার উপরে মন্থর গতিতে ঘুরছে।

দৃষ্টি ফেলাতে পারলো না নূরী। তার চোখের ঘুম হারিয়ে গেছে কোথায়। বনহুর নিশ্চয়ই এখনও ছুটে চলেছে তাজের পিঠে। যদিও যানটি এখনও পর্বতের পাশে নেমে আসেনি।

নূরী জানে প্রভুকে পিঠে পেলে তাজ নতুন জীবন ফিরে পায়। যদিও তাজের বয়স হয়েছে তবুও ওর বিশেষ সেবা-যত্ন এবং খাওয়ার দরুন আজও সে সতেজ আছে। বনহুরের কথা ভাবে নূরী, ঊনিশশো পঁয়ষট্টি সনে বনহুরের বয়স ছিলো বাইশ, আজ উনিশশো আটাশি সনে হয়েছে পঁয়তাল্লিশ বছর। আজও সে তেমনি আছে, তার পৌরুষদীপ্ত সুন্দর মুখমন্ডল আজও সবাইকে আকৃষ্ট করে। তার চেহারার তেমন কোনো পরিবর্তন আসেনি আজও, মনটাও তেমনি আছে, দুর্জয় সাহস আর শক্তির প্রতীক সে। নূরীর খেলার সাথী ছিলো বনহুর। আজ নতুন করে তার মনের পর্দায় ভেসে ওঠে অনেক স্মৃতি। ছোটবেলা থেকেই বনহুরকে সে দুঃসাহসী, দুরন্ত দেখে এসেছে। একসঙ্গে ঘোড়ায় চড়ে বনে-জঙ্গলে শিকারের সন্ধান করে ফিরেছে। বাঘ-ভালুক সিংহ ছিলো বনহুরের খেলার সাথী। পাহাড় থেকে পাহাড়ে লাফিয়ে পড়া, নদীতে সাঁতার কাটা, ঘোড়ায় চড়ে এ পাহাড় থেকে ও পাহাড়ে লাফ দেওয়া এসব ছিলো তার নেশা। অবশ্য এটা বেশ বড় হওয়ার পর অভ্যাস করেছিলো।

বনহুর যখন ঘোড়া নিয়ে এ পাহাড় থেকে ও-পাহাড়ে লাফ দিতো তখন নূরী দুহাত দিয়ে নিজের চোখ দুটো চেপে ধরে রাখতো, তার ভয় হতো যদি সে নিচে ঘোড়াসহ পড়ে যায় তখন চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবে তার মাথাটা। থেতলে যাবে দেহটা, রক্তের ধারা ছুটবে…না না, তা সে সহ্য করতে পারবে না। আর সে কারণেই নূরী দুহাতে নিজের চোখ বন্ধ রাখতে। বনহুর যখন ঘোড়াসহ অপর পতটার উপরে লাফিয়ে পড়ে ডাকতো, নূরী দেখোতখন নূরী দু'হাত সরিয়ে ভীতভাবে তাকাতো। বলতো নুরী, তোমার সাহস দেখে অবাক হই, যদি পড়ে যেতে নিচে।

ততক্ষণে বনহুর নিচে নেমে আসতো, নূরীর পাশে দাঁড়িয়ে হাতের পিঠে ললাটের ঘাম মুছতো। তখন নূরী বলতো, দেখো বুকটা আমার এখনও ধকধক করছে। বনহুর বলতো, বলেছিতো তোমরা মেয়েমানুষ, তোমাদের কোমল মন, তাই একটুতেই বড় ঘাবড়ে যাও…কত কথা আজ নতুন করে মনে পড়েছে নুরীর। বনজঙ্গলে মানুষ হলে কি হবে, বনহুর লেখাপড়ায় ছিলো অত্যন্ত ভাল। কালু খাঁ দস্যু হলেও তার মন ছিলো বড়, শিক্ষাকে সে দাম দিতে। বনহুর লেখাপড়া করুক এটাই ছিলো তার লক্ষ্য আর সেই কারণে কালু খাঁর চেষ্টা ছিলো অপরিসীম

বনহুরকে যেমন দস্যু বানিয়েছিলো, তেমনি তাকে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিতও করেছিলো সে। বিদেশে রেখে সে বনহুরকে সব রকম ভাষায় শিক্ষিত করেছিলো। তাই বনহুর অন্যান্য মানুষের চেয়ে পৃথক ছিলো। শুধু লেখাপড়া নয়, অশ্ব থেকে এরোপ্লেন চালনায় পর্যন্ত দক্ষ ছিলো বনহুর। সাঁতার কাটায় তার মত পটু কেউ ছিলো না। ডুবুরী হিসেবেও ছিলো তার অভিজ্ঞতা। কাল খার প্রচেষ্টা সার্থক হয়েছিলো সব দিক দিয়ে। সেই বনহুকে নূরী ভালবেসেছিলো মন প্রাণ দিয়ে। ভাবততা নূরী, বনহুর কোনোদিনই তার কাছ থেকে হারিয়ে যাবে না, সর্বক্ষণ সে থাকবে তার কাছে কাছে। কিন্তু যতই বনহুরের বয়স বাড়তে লাগলো, ততই সে তার কাছ থেকে দূরে সরে যেতে লাগলো।

অনেক দিন নূরী বনহুরকে নিবিড়ভাবে কাছে পেলেও যেন পায়নি। বনহুর যেন সবার ধরা-ছোঁয়ার বাইরে…হঠাৎ নূরীর চিন্তাধারায় বাধা পড়ে। কান্দাই পর্বতমালার উপরে নীলাভ আলোর বলয় যানটি নেমে পড়েছে। তবে কি হুর পৌঁছে গেছে সেখানে? হয়তো তাই হবে, হুর নিশ্চয়ই যানটিতে উঠে পড়েছে, দ্রুত যানটি ভেসে উঠেছে আকাশের দিকে।

সামান্য সময়ের মধ্যে যানটি নীলাভ আলো ছড়িয়ে আকাশে বিলীন হয়ে যায়।

নূরী ফিরে আসে শয্যায়।

মাথাটা তার ঝিমঝিম করছিলো, অল্পক্ষণেই ঘুমিয়ে পড়ে সে।

পরদিন।

তাজের পাশে এসে দাঁড়ালো নূরী। তাজের পিঠে হাত বুলিয়ে বললো–তাজ, তোর প্রভুকে কোথায় রেখে এলি! কখন এসেছিস…

অদূরে দাঁড়িয়ে ছিলো রহমান। তাজের পাশে দাঁড়িয়ে নূরী যে কথাগুলো বললো সব সে শুনতে পেয়েছিলো। বললো রহমান—তাজ, ভোরে ফিরে এসেছে। তারপর এগিয়ে এসে নূরীর পিঠে সান্ত্বনার হাত বুলিয়ে দেয়।

এখানে যখন রহমান আর নরী তাজের পাশে দাঁড়িয়ে কথাবার্তা বলছিলো তখন বনহুর আর রাণী উড়ন্ত শশারে চেপে নীল আকাশে ভেসে চলেছে। দিনের বেলায় উড়ন্ত শশার থেকে যে নীলাভ আলো বিচ্ছুরিত হতো তা পৃথিবীর মানুষের

দৃষ্টিগোচর হতো না। সূর্যের আলোতে নীলাভ আলোর ছটা হারিয়ে যেতো আকাশের নীলিমায়।

বাংলাদেশে পৌঁছতে বেশি সময় লাগলো না।

বনহুর আর রাণী সবার অগোচরে বন্যাপ্লাবিত স্থানগুলোতে গিয়ে তাদের দুঃখ-দুর্দশা দেখতে লাগলো এবং অসহায় মানুষগুলোর হাতে প্রচুর অর্থ দিতে লাগলো, যা দিয়ে তারা নিজেদের জীবন রক্ষা করতে পারে। তারা যেন সত্যিকারের মানুষ হিসেবে বাঁচতে পারে।

যারা জলবন্দী হয়ে মেঝেতে বাঁশের মাচা তৈরি করে, ঘরের চালায়, গাছের ডালে তাদের পাশে এসে চরম দুর্ভোগ ও সীমাহীন কষ্টে বাস করছে। সবাইকে সান্তনাবাক্য দিয়ে এক এক পরিবারকে প্রচুর অর্থ দান করতে লাগলো বনহুর ও রাণী। রাণীও পুরুষের ড্রেসে সজ্জিত হয়ে বনহুরের পাশাপাশি কাজ করে যেতে লাগলো। বনহুর আর রাণী বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে বিচরণ করে ফিরতে লাগলো।

প্লাবনে যাদের ভেসে যাবার উপক্রম তাদের বনহুর তুলে নিয়ে শুকনো জায়গায় রেখে আসতে লাগলো। একটি মজবুত প্লাস্টিক নৌকা তারা উড়ন্ত শশারে নিয়ে এসেছিলো, সেই নৌকাখানা ব্যবহার করতে লাগলো। কাজ শেষ হলে নৌকাখানার হাওয়া ছেড়ে দিতে এবং ভাজ করে গুটিয়ে রাখতে।

চট্টগ্রামের এক পাহাড়িয়া অঞ্চলে যেখানে কোন লোকজন বসবাস করতো না সেই স্থান তারা বেছে নিলো উড়ন্ত শশারটিকে রাখার জন্য। এখানেই বনহুর আর রাণী বিশ্রাম করতে এবং আলাপ আলোচনা করতো কোথায় কোন স্থানে তারা এরপর কাজ করবে। গভীর রাতে বনহুর আর রাণী উড়ন্ত-শশারে এক স্থান হতে অন্যস্থানে যেতো। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে তারা উড়ন্ত শশারে গিয়ে পৌঁছতো। তারা শুনেছে বিদেশ থেকে বন্যাদুর্গত এলাকার অসহায় মানুষদের জন্য প্রচুর খাদ্য এবং বস্ত্র আসছে। বিদেশের সাহায্য ছাড়াও বাংলাদেশ সরকার যথাযথভাবে এইসব অঞ্চলে নানাভাবে সাহায্যদান করে চলেছে। এমনকি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীও অক্লান্তভাবে দুর্গত এলাকায় ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করে যাচ্ছে। প্রচুর সাহায্যদান করেছে বাংলাদেশের সর্বস্তরের জনগণ। তারাও যথাসাধ্য দুর্গত এলাকায় গিয়ে দুর্গতদের সেবা করছে। দান করছে বস্ত্র এবং

খাদ্যসামগ্রী। তবুও অভাব রয়েছে, কারণ সর্বহারা মানুষরা তাদের সবকিছু হারিয়েছে, সহজে তা পূর্ণ হবার নয়।

বনহুর সন্ধান চালালো ছদ্মবেশে, কোথায় কোনো অসৎ ব্যক্তি দুর্গত জনগণের মুখের আহার নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে কিনা। যে অর্থ জনসাধারণ মুক্তহস্তে দান করছে তা গোপনভাবে কেউ আত্নসাৎ করছে কিনা। বিদেশের সাহায্যগুলো ভাগ-বাটোয়ারা হয়ে কালোবাজারে চালান হচ্ছে কিনা।

কয়েক দিনের মধ্যেই বনহুর সব জেনে নিলো অগোচরে। কে কোথায় কিভাবে কাজ করছে। দুঃস্থ অসহায় মানুষদের ন্যায্য প্রাপ্য থেকে কে বঞ্চিত হচ্ছে এবং কারা তাদের বঞ্চিত করছে। বনহুর জানে যে দেশেই প্রাকৃতিক দুর্যোগ শুরু হয়, তখন এক শ্রেণীর মানুষ নিঃস্ব রিক্ত হয় আর এক শ্রেণীর মানুষ ঐশ্বর্যের ইরামত গড়ে তোলে। বিড়ালতপস্বী সেজে জনদরদীর বেশে গ্রাস করে সেই নিঃসহায় মানুষদের মুখের খাবার। আর জানে বলেই বনহুর এ ছদ্মবেশ ধারণ করেছে।

বনহুর নিত্য নতুন ছদ্মবেশে এই অনুসন্ধান চালালো। কখনও ব্যবসায়ী, কখনও বিদেশী রাষ্ট্রদূত হিসেবে। কখনও রিক্সাচালক, কখনও ড্রাইভারের বেশে শহর বন্দর, গ্রাম হতে গ্রামান্তরে। আবার ঠিক সময়মত চলে যেতো বন্যাদুর্গত এলাকায় বন্যাপীড়িত জনগণের মধ্যে। এমনকি সৈনিক বেশেও বনহুর বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সঙ্গে অসহায় মানুষদের পাশে গিয়ে তাদের সহায়তা করতে লাগলো। রাণীও পুরুষের বেশে বনহুরকে সহায়তা করে চললো।

বনহুর আর রাণী কখনও কখনও ষ্টেশনে কুলি-মজুরের বেশে কাজ করে। মাল উঠানো নামানো ছিলো তাদের কাজ। সেখান থেকেই বুঝে নিতে কোন মাল কোথায় যায়। কখনও রিক্সাচালকের বেশে দোকান বা রেষ্টুরেন্টের সামনে রিক্সা নিয়ে অপেক্ষা করে, কোনো সময় ধনকুবেরদের বাসায় গাড়ির ড্রাইভার। কখনও কলকারখানায় শ্রমিক হিসেবে কাজ করে চললো।

কখনও সে চট্টগ্রাম বন্দরে খালাসীর কাজে নিয়োজিত থাকে। আবার কখনও বিমান বন্দরে। ঢাকা এবং চট্টগ্রামে হোটেলেও বনহুর ও রাণী অবস্থান করতে লাগলো।

সেদিন ঢাকায় এক বিশিষ্ট হোটেলের কামরায় বনহুর বিশ্রাম গ্রহণ করছিলো। হঠাৎ রাণী পাশের কামরা থেকে এ কামরায় প্রবেশ করে।

বনহুর তখন নামাজ আদায় করছিলো।

তার শরীরে শুধু ড্রেস, পাজামা-পাঞ্জাবী। অপূর্ব লাগছে তাকে। রাণী থমকে দাঁড়ালো, অপেক্ষা করতে লাগলো বনহুররের নামাজ শেষ হবার জন্য। হাতে তার দৈনিক পত্রিকা।

বনহুর নামাজ শেষ করে জায়নামাজখানা ভাঁজ করে রাখে তার খাটের পাশে, তারপর বলে–এসো রাণী।

রাণী এগিয়ে আসে। বনহুরকে লক্ষ্য করে বলে রাণী–আজকের সংবাদপত্র পড়েছো?

বনহুর বললো–সময় হয়নি।

রাণীর দিকে একটি চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বলে বনহুর–বসো। তারপর নিজে খাটে পা ঝুলিয়ে বসে।

রাণী সংবাদপত্রের এক জায়গায় আংগুল দিয়ে দেখিয়ে বললো—পড়ে দেখো বনহুর।

বনহুর পড়তে লাগলো—

গভীর রাতে বাংলাদেশের আকাশে বিস্ময়কর আলোর বলয়।–বেশ কিছুদিন হলো একটি নীলাভ আলোর বলয় গভীর রাতে আকাশে এদিক সেদিকে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়। এই আলোর বলয় জনসাধারণের মনে বিস্ময় সৃষ্টি করেছে। অনেকের ধারণা এ আলোর বলয় কোনো গ্রহ অথবা উপগ্রহ থেকে নেমে এসেছে। বৈজ্ঞানিকগণ এ ব্যাপারে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। জনসাধারণ এই আলোর বলয় দেখার জন্য প্রতিদিন গভীর রাতে খোলা ছাদে অথবা মাঠে অপেক্ষা করে থাকে। গতরাতেও এই আলোর বলয় গভীর রাতে দেখা গিয়েছে।

সংবাদপত্রটা ভাজ করে রেখে গম্ভীর মুখে বললো বনহুর–রাণী, আরও এক ঘটনা আমি উদঘাটন করেছি। বিদেশী সাহায্য এবং জনসাধারণের ত্রাণ সাহায্য দুঃস্থ মানুষদের হাতে ঠিকমত পৌঁছছে না। গতকাল একজন অসৎ ব্যবসায়ীর কাছে যখন এক কোটি টাকার ত্রাণসামগ্রী পাচার করা হচ্ছিলো তখন আমি সে নরপশু শয়তানদের অনুসরণ করি এবং পুলিশের হেড কোয়ার্টারে জানিয়ে দেই।

সমস্ত মাল আটক করা হয়েছে। সেই অসৎ ব্যবসায়ী ও পাচারকারীদেরও গ্রেপ্তার করা হয়েছিলো…

তারপর?

কোনো স্বনামধন্য ব্যক্তির টেলিফোন পেয়ে এই অসৎ ব্যবসায়ী এবং পাচারকারীদের সবাইকে মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে।

তাই নাকি?

হাঁ। কিন্তু আজ রাত তাদের শেষ রাত হবে। পুলিশমহল মুক্তি দিলেও…

বনহুর তুমি…

আমি সেই নরপশু ব্যবসায়ীর গাড়িতে ড্রাইভারের চাকরি নিয়েছি। কথাটা বলে হাসলো বনহুর। তারপর উঠে এসে ব্যাগ খুলে বের করলো জমকালো রিভলভার। গুলী ভরে নিয়ে বললো—অর্থের মোহ ঘুচিয়ে দেবো। গুলশানে ইমরাত গড়ে তোলার মোহ কেটে যাবে। জানো রাণী, অসৎ ব্যবসায়ীটি বাংলাদেশের জনসাধারণের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে তাদের রক্ত শুষে নিয়ে গুলশান, ধানমন্ডিতে কয়েকটি ইমারত গড়ে তুলেছে, গাড়ি বাড়ি ঐশ্বর্যের হিসাব নিকাশ নেই, ব্যাংকে জমা আছে কোটি কোটি টাকা। শুধু এই ব্যক্তিই নয়, আরও অনেক স্বনামধন্য ব্যক্তি রয়েছেন যারা মুখোশের অন্তরালে জনদরদী সেজে দেশ ও দশের সর্বনাশ করে চলেছেন। আমি তাদের লিস্ট তৈরি করে নিয়েছি।

বনহুর, তুমি বন্যাদুর্গত এলাকার জনগণের দুঃখ-দুর্দশা দেখতে এসে এরই মধ্যে এত সন্ধান নিলে কখন।

পরে সব জানতে পারবে। তবে আমি এদের নিষ্কৃতি দেবো না। এদের মুখোশ উন্মোচন করবোই।

*

ড্রাইভার, পথটা বড় অন্ধকার লাগছে! বললেন ব্যবসায়ী ধনকুবের রায়হান হামিদ।

ড্রাইভার বললো—স্যার, সব সময় আলোতে থাকেন কিনা তাই। আর কিছুটা এগুলেই সাভার পৌঁছে যাবো। ওরা সেখানেই আপনার জন্য অপেক্ষা করছে।

খুব সাবধানে গাড়ি চালাও।

হাঁ স্যার, সাবধানেই চালিয়ে নিচ্ছি তবে সামনে বড় একটা খাদ আছে। পথটা তাই দুর্গম…

ও আলোটা কিসের?

শহীদ মিনারের চূড়া…

সেখানে আলো দেওয়া হয়েছে?

জানেন না স্যার ওটা আসল আলো নয়, আলেয়ার আলো।

তার মানে?

স্বাধীনতা যুদ্ধে যারা দেশকে স্বাধীন করতে প্রাণ দিয়েছিলো তাদের সবার আত্মা জড়ো হয়ে শহীদ মিনারে এসে মাঝে মাঝে সভা করে, তখন ঐ আলো দেখা যায়, ওর নাম আলেয়ার আলো। স্যার, যারা দেশকে ভালবেসেছিলো, দেশের জনগণকে ভাল বেসেছিলো তারাই স্বাধীনতা যুদ্ধে এগিয়ে গিয়েছিলো। জানতো মরতে তাদের হবেই। জীবন বিসর্জন দিয়েও তারা চেয়েছিলো দেশ স্বাধীন হলে বাংলাদেশের মানুষ-তাদেরই বাপ মা, ভাই বোন-তারা শান্তিতে বসবাস করতে পারবে। স্বাধীনভাবে কথা বলতে পারবে। অন্ন-বস্ত্র পাবে, ক্ষুধায় ধুকে ধুকে মরতে হবে না। স্যার, তারা মরিয়া হয়ে যুদ্ধ করেছিলো নিজেদের জীবন বিসর্জন আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে, আজ তা বিফল হয়ে গেছে। তাদের রক্ত দান ব্যর্থ হয়ে গেছে, কারণ বাংলাদেশের মানুষ আজ দিশেহারা। ক্ষুধায় কাঁদে তাদের বাবা-মা-ভাই বোন সকলে। পরনে জোটে না বস্ত্র, ভাঙা থালা হাতে ফুটপাতে বসে বসে চোখের পানি ফেলে। আর এক শ্রেণীর মানুষ স্বাধীনতাকে মূলধন করে অসহায় নিঃস্ব রিক্ত মানুষকে শুষে নিয়ে ধনকুবের বনে গেছে। অন্যায় অনাচারে ভরে উঠেছে চারদিক। স্বাধীনতার মূল্য কি তারা এটাই চেয়েছিলো? তাই শহীদদের আত্মা হাহাকার করছে, ওদের জীবন দেওয়া বৃথা হয়ে গেছে স্যার…তাই ওরা সময় সময় শহীদ মিনারে এসে বৈঠক করে। তাদের

লিস্টে নামগুলো লিখে নেয়। তারা কারা যারা তাদের এই স্বাধীনতাকে নস্যাৎ করে দিয়েছে…

ড্রাইভার, এসব কি বলছো তুমি!

যা সত্য তাই বলছি স্যার। শুনবেন তাদের লিস্টে কার নাম প্রথম লেখা হয়েছে।

তুমি তা কেমন করে জানলে? রাগতভাবে বললেন রায়হান হামিদ।

ড্রাইভার গাড়ি থামিয়ে বললো—আমিও যে ওদেরই একজন।

তুমি, তুমি প্রেত আত্মা?

হাঁ, তাইতো আমি লিস্টখানা পেয়েছি।

তামাশা করোনা ড্রাইভার।

তামাশা! নগণ্য এক ড্রাইভারের সাহস আছে আপনার সঙ্গে তামাশা করে? নিন এবার নেমে পড় ন স্যার

কোথায় ওরা যাদের সঙ্গে আমার কথাবার্তা পাকা হবে?

তারা সাভারের এক স্থানে আপনার অপেক্ষায় প্রহর গুণছে।

তবে যে বললে তুমি পথ চেনো? নইলে মোল্লা ড্রাইভারকে সঙ্গে আনতাম।

নামুন।

এ যে চারপাশে জঙ্গল।

হাঁ, এখানেই আজকের লিস্টের প্রথম যিনি তার বিচার হবে।

মোহসীন আলী, তোমার বাড়াবাড়ি চরমে উঠেছে দেখছি। তুমি আমাকে ধাকা দিয়ে নিয়ে এসেছো ভুল পথে।

থোকা আমি দিয়েছি…হাঃ হাঃ হাঃ সর্বহারা অসহায় মানুষদের থোকা দিয়ে দিয়ে অভ্যস্ত আপনারা।

কে-কে তুমি!

স্বাধীনতা যুদ্ধে যারা জীবন দান করেছে, যারা এক বুক রক্ত দিয়েছে আমি তাদের ভাই।

কি জন্য তুমি আমাকে এই নির্জন স্থানে অন্ধকারে নিয়ে এলে। আমি প্রহরী আনিনি, কারণ তুমি নতুন হলেও আমার বিশ্বাসী…আর সেই কারণেই আমি….

ড্রাইভার নেমে পড়েছিলো তার আসন থেকে। এবার পকেট থেকে রিভলভার বের করে। গাড়ির পেছন আসনে বসে থাকা মিঃ আর হামিদকে লক্ষ্য করে বললো—নেমে পড়ুন। গাড়িখানা আপনার রক্তে কলুষিত না করে পবিত্র রাখুন…….

কঠিন কণ্ঠে বললেন মিঃ আর হামিদ-ড্রাইভার, আমার কাছেও ঐ বস্তু আছে।

কিন্তু বের করার সুযোগ আপনি পাবেন না! মিঃ আর হামিদ পকেটে হাত দেবার পূর্বেই ড্রাইভার তার রিভলভারখানা আর হামিদের বুকে চেপে ধরলো, দাতে দাঁত পিষে বললো নরপশুর শাস্তি মৃত্যুদন্ড! এতদিন যে অপকর্ম করেছে তার শাস্তি গ্রহণ করো। মরবার পূর্বে শুনে যাও শয়তান, তুমি প্রথম শিকার, বাংলাদেশের অসৎ ব্যক্তিদের মধ্যে একনম্বরে, তারপর চলতে থাকবে…… ড্রাইভারের রিভলভার গর্জে ওঠার পূর্বে আর হামিদের মুখমন্ডল রক্তশূন্য হয়ে পড়লো। হাত জুড়ে বললো–এবার মাফ করে দাও, আমি যথাসর্বস্ব বিলিয়ে দেবো অসহায় গরিব জনগণের মধ্যে।

সে সুযোগ আর আসবে না শয়তান…মিঃ আর হামিদের রক্তাক্ত দেহ ঢলে পড়লো গাড়ির কোমল ভেলভেটের আসনে।

*

গাড়ি ফিরে এলো।

দারোওয়ান গেট খুলে দিলো।

গাড়ি গ্যারেজে রেখে উপরে উঠে এলো ড্রাইভার। সম্মুখে বেগম সাহেবা ব্যাকুলভাবে স্বামীর আগমনের অপেক্ষায় প্রহর গুণছেন। রাত ভোর হয়ে এলো প্রায়।

বেগম সাহেবা স্বামীর জন্য ভাবছেন, তিনি বলে গিয়েছিলেন কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরবেন। টেবিলে খাদ্যসম্ভার ঢাকা দেওয়া আছে তেমনি। এমনকি বেগম সাহেবাও খাবার গ্রহণ করেননি। বারবার তিনি হাতঘড়িটা দেখছিলেন।

ভোরের আজানধ্বনি ভেসে এলো বেগম সাহেবার কানে, এখনও তো ফিরলেন না আর হামিদ।

এমন সময় গাড়ির শব্দ হলো।

বেগম সাহেবা ভাবলেন যাক এতক্ষণে তাহলে এলেন আর হামিদ। কিন্তু ড্রাইভারকে একা এসে দাঁড়াতে দেখে বেগম সাহেবা ব্যস্তভাবে কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, তার পূর্বেই ড্রাইভার গাড়ির চাবি বেগম সাহেবার দিকে বাড়িয়ে ধরে বললো– গাড়ির চাবি রাখুন, আমি আর চাকরি করবো না।

সাহেব কোথায়? বেগম সাহেবা জিজ্ঞেস করলো ড্রাইভারকে।

ড্রাইভার চাবি বেগম সাহেবার হাতে দিয়ে বললো—-তিনি গাড়িতেই রয়েছেন।

কথাটা বলে ড্রাইভার দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে গেলো।

বেগম সাহেবা কিছুক্ষণ বিস্ময় নিয়ে ড্রাইভারের চলে যাওয়া পথের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর চিৎকার করে ডাকলেন–হাসেম, হাসেম…সাহেব গাড়িতে কি করছেন দেখো। তাকে নিয়ে এসো, দেখো হয়তো ঘুমাচ্ছেন……।

হাসেম পুরোন চাকর, চোখ রগড়ে এসে দাঁড়ালো–বেগম সাহেবা আমাকে ডাকছেন?

হাঁ, দেখো সাহেব গাড়িতে বুঝি ঘুমিয়ে পড়েছেন। ড্রাইভার গাড়ির চাবি দিয়ে চলে গেলো। যাবার সময় বললো সে আর চাকরি করবে না। ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম না। সাহেব হয়তো রাগারাগি করেছেন। যাও তো দেখো, ডেকে আনো তাকে।

হাসেম চলে গেলো।

একটু পর ফিরে এসে বললো–গাড়ি গ্যারেজে উঠানো হয়েছে। সাহেবকে তো দেখলাম না।

বেগম সাহেবার বুকটা ধক করে উঠলো। তিনি হাসেমের সঙ্গে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এলেন। ততক্ষণে দারোয়ানও অন্য চাকর-বাকর সবাই এসে গাড়ি বারান্দায় জড়ো হয়েছে। শুধু ড্রাইভার গাড়ি রেখেই চলে গেছে। এমন কি মালি, মাইল্লানী তারাও এসে জড়ো হলো। সাহেব আসেননি। তবে গাড়ি নিয়ে ড্রাইভার এলো, কিন্তু সাহেব কোথায়?

আর হামিদের বড় ছেলে বিদেশে থাকে।

মেঝো ছেলে জার্মান-এ পড়াশোনা করছে।

ছোট ছেলেও এস, এস, সি, পাস করে লন্ডন গিয়েছে চাচার সঙ্গে বেড়াতে। তাদের লন্ডনে পড়াশোনার জন্য পাঠাবেন তাই আর হামিদ পাঠিয়েছেন কেমন লাগে দেখার জন্য। চাকর-বাকর ছাড়া তেমন কেউ নেই বাড়িতে।

বেগম সাহেবা বললেন–ড্রাইভার আজ কেমন যেন বেয়াড়াভাবে কথা বলছিলো। ওর দাড়ী গোঁফওয়ালা মুখখানা কেমন যেন উত্তেজনাপূর্ণ মনে হলো।

রাতটুকু কেটে গেলো নানা জল্পনা-কল্পনার মধ্যে।

কারও চোখে আর ঘুম এলো না।

ড্রাইভারকেও খুঁজে পাওয়া গেলো না কোথাও।

ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ অফিসে ফোন করলেন বেগম সাহেবা। আত্মীয়স্বজন সবাই জানলেন আর হামিদ রাতে বাইরে গিয়েছিলেন, তিনি ফিরে আসেননি।

একটু পর পুলিশ কর্মকর্তা এলেন সঙ্গীদের নিয়ে।

হলঘরে বসে সব শুনলেন পুলিশ কর্মকর্তা।

তিনি বেগম সাহেবাকে বললেন–গ্যারেজে গাড়িখানা পরীক্ষা করে দেখা দরকার, কারণ ড্রাইভারের কথাবার্তা এবং গাড়ির চাবি ফিরিয়ে দিয়ে চাকুরী আর করবে না বলার পেছনে কোন কারণ বা উদ্দেশ্য থাকতে পারে।

পুলিশপ্রধান গ্যারেজের চাবি নিয়ে গ্যারেজের দরজা খুলতে বললেন এবং তিনি বেগম সাহেবা ও অন্যদের নিয়ে এলেন। গ্যারেজের দরজা খুলতেই দারোয়ান ভয়ার্ত আর্তনাদ করে উঠলো–বেগম সাহেবা, সাহেব গাড়িতেই.....

পুলিশপ্রধান এগিয়ে এলেন গ্যারেজের ভেতরে, তার পেছনে অন্য সবাই।

পুলিশপ্রধান বললেন–আর, হামিদ খুন হয়েছেন।

কথা শেষ হয় না পুলিশ প্রধানের। বেগম সাহেবা সংজ্ঞা হারিয়ে ফেললেন।

সবাই দেখলো আর হামিদ গাড়ির পেছন আসনে কাত হয়ে পড়ে আছেন। চাপচাপ রক্ত জমাট বেঁধে আছে তার বুকের পাশে। গাড়ির পেছন আসনে রক্ত জমাট বেঁধে আছে।

মিসেস হামিদ চিৎকার করে কেঁদে উঠলেন, তারপর আছাড় খেয়ে পড়লেন গাড়ির পাশে গ্যারেজের মেঝেতে।

মিঃ আর হামিদের লাশ গাড়ি থেকে বের করা হলো। তার বুকের সঙ্গে ছোট্ট কাগজে লেখা,

অসৎ ব্যবসায়ী, চোরা কারবারী অসৎ ধনকুবের আর হামিদ প্রথম শিকার। দ্বিতীয় শিকার...তৃতীয় শিকার। ...চতুর্থ শিকার...প্রতি সপ্তাহে তাদের অসৎ উপায়ে উপার্জিত ঐশ্বর্যের হিসাব নিকাশ গ্রহণ করা হবে এবং তাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত মৃত্যু সুধা প্রদান করা হবে। পুলিশমহল অথবা কোন স্বনামধন্য ব্যক্তির সুপারিশ এদের পাওনা থেকে রেহাই দিতে পারবে না। —ন্যায়দন্ড

*

আর হামিদের হত্যাকান্ড ঘটনাটা সবার মনেই আতঙ্ক সৃষ্টি করলো। শুধু আতঙ্কই নয়, বাংলাদেশের ধনকুবেরু যাদের নিজেদের প্রতি আত্মবিশ্বাস নেই সেই সব ধনবান ঐশ্বর্যবান ব্যক্তিদের হৃদকম্প শুরু হলো। মিঃ আর হামিদের

হত্যাকান্ড স্বাভাবিক হত্যাকান্ড নয়, এই হত্যার পেছনে লুকিয়ে আছে নিবিড় একটি রহস্য।

বাংলাদেশের পত্র-পত্রিকাগুলোতে শহরের স্বনামধন্য ব্যবসায়ী মিঃ আর হামিদের রহস্যজনক মৃত্যু-সংবাদ নানাভাবে প্রচারিত হলো। নিহত আর হামিদের প্রাণহীন দেহের ফটো ছাপা হলো। এমনকি নিহত আর হামিদের বুকের সঙ্গে আটকানো চিঠিখানাও ছাপানো হয়েছে। এ সংবাদটি প্রতিটি দৈনিক পত্রিকায় প্রথম পৃষ্ঠায় ছাপা হয়েছে। চায়ের টেবিলে বসে শহরবাসী সবাই সংবাদটা পড়লেন। ফুটপাতে দাঁড়িয়ে পথচারিগণ দু'চোখে বিস্ময় নিয়ে পড়তে লাগলো। তারা কাজের কথা বা গন্তব্যস্থানে পৌঁছানোর কথা ভুলে গেলো। দোকানে, রেষ্টুরেন্টে, হোটেলে এমন কি প্রতিটি অফিসে পৌঁছে গেলো সংবাদটা। সবার চোখেমুখে প্রকাশ পেলো ভয়ভীতি আতঙ্কের ছাপ। মিঃ আর হামিদের পর কারও এ অবস্থা হবে তা তারা জানে না। তবে জানে এরপর এগিয়ে আসছে দ্বিতীয় জনের দিন। সেই মুহূর্ত কখন কি ভাবে আসবে কেউ জানে না। যারা উঁচু মানুষ, স্বনামধন্য ব্যক্তি যাদের বিশ্বাস নেই নিজেদের ওপর তাদের হৃদকম্প শুরু হলো। তারা জানেন তাদের ধন-সম্পদ ঐশ্বর্য কিভাবে এসেছে, কাদের রক্ত শোষণ করে তারা আজ স্বনামধন্য ব্যক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। বুক কাঁপলো তাদেরই, ঘূর্ণীয়মান চেয়ারে বসে সুখস্বপ্নে যারা বিভোর ছিলেন, সেই তাদের যেন হুশ হলো। কি ভয়ংকর মিঃ আর হামিদের মৃত্যু...।

পুলিশমহল সজাগ, গোয়েন্দা বিভাগের লোকজন সচেতন, সবার মনেই নাড়া দিয়েছে প্রখ্যাত ধনকুবের ব্যবসায়ী মিঃ আর হামিদের মৃত্যু। এরপর কার পরপারে যাওয়ার ডাক আসে কে জানে। স্ত্রীগণ নিজ নিজ স্বামীদের হেফাজত নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। তারা কেউ অকালে স্বামীকে হারাতে চান না, বৈধব্যের কি জ্বালা তা তারা জানেন। স্বামীহারা নারীর ব্যর্থ জীবন, শাড়ি গয়নার প্রাচুর্য চিরদিনের জন্য বিদায় নেয় তাদের কাছ থেকে। মূল্যবান শাড়ি, লক্ষ লক্ষ টাকার অলংকার বাক্সবন্দী হয়ে হাহাকার করে কাঁদে। শাড়ি গহনাবিহীন নাদুস নুদুস কোমল দেহ, সৌন্দর্য অর্থহীন হয়ে পড়ে। স্বামী যার থাকে না কি হবে তার ঐশ্বর্য প্রাচুর্য থেকে? তাই স্ত্রীগণ ভীষণ ভাবনায় পড়লেন, না জানি কোন মুহূর্তে তাদের মিঃ আর হামিদের স্ত্রীর মত অবস্থা হয়।

এইসব স্বনামধন্য ব্যক্তির স্ত্রীগণের আতঙ্কের শেষ নেই। স্বামীকে তারা কক্ষের বাইরে যেতে দিতে রাজি নয়, দৃষ্টির আড়ালে গেলেই মন তাদের ধকধক্ করে

ওঠে। উচ্চৈস্বরে বলেন–ওগো কোথায় গেলে!

স্বামীর বুকেও আতঙ্ক, বলেন-এই তো এখানে আছি!

এত সতর্কতার মধ্যেও স্ত্রীর পাশে নিহত হলেন মিঃ আসলাম চৌধুরী। কয়েকটি ইন্ডাষ্ট্রির মালিক, কোটি কোটি টাকা যার বিদেশী ব্যাংকে জমা আছে, গাড়ি-বাড়ি প্রাচুর্যের অভাব নেই, এহেন চৌধুরী সাহেব নিজ স্ত্রীর পাশে ঘুমন্ত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলেন।

সকালবেলা কি চাকর এবং বয়ের ডাকে ঘুম ভাঙলো বেগম চৌধুরী, এমন করে ডাকাডাকি করছে কেন ওরা! একসঙ্গে অনেকগুলো কণ্ঠ শুনতে পাচ্ছেন বেগম চৌধুরী। নিদ্রা ছুটে যেতেই পাশ ফিরে আর্তনাদ করে উঠলেন বেগম চৌধুরী–সর্বনাশ হয়ে গেছে, ওরে তোরা ছুটে আয়, তোরা ছুটে আয়, সাহেব খুন হয়েছে...

বেগম চৌধুরী দরজা খুলবার পূর্বেই দরজা ভেঙে কক্ষে প্রবেশ করলো ছেলে-মেয়ে আর চাকর-বাকর। সবাই দেখলো মিঃ আসলাম চৌধুরীর বুকে ছোরা গেঁথে আছে। রক্তের চাপ শুকিয়ে আছে বুকের ওপর। গড়িয়ে গড়িয়ে সুকোমল বিছানাও সিক্ত হয়েছে তাজা রক্তে।

মিঃ আসলাম চৌধুরীর বুকেও মিঃ আর হামিদের মত একটি কাগজ আটকানো। কাগজখানা খুলে নিয়ে কান্নাজড়িত কণ্ঠে পড়তে লাগলো মিঃ চৌধুরীর বড় ছেলে সেলিম চৌধুরী দ্বিতীয় শিকার, সাধুতার মুখোশধারী গরীবের রক্ত শোষণকারী নরশয়তান মিঃ আসলাম চৌধুরী। অন্যায় কোনোদিন চাপা থাকে না। পাপের প্রায়শ্চিত্ত তাদের হবেই।

—ন্যায়দন্ড

পড়া শেষ করে উচ্ছ্বসিতভাবে কাঁদতে কাঁদতে বললো সেলিম চৌধুরী–আমি বার বার আব্বুকে বলেছি অসৎ পথে অর্থ উপার্জন ছেড়ে দাও আব্বু। আমরা লেখাপড়া শিখেছি, আমাদের সামনে তুমি অন্যায় করে যাবে তা আমরা সহ্য করতে পারছি না...আব্বু তা শোনেননি। আম্মু কেন তুমি আগে বারণ করোনি! অন্যায় করলে একদিন না একদিন তার মাসুল দিতে হবে...।

বেগম চৌধুরী সন্তানকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বললেন—খোকা…কে তোকে বলেছে তোর আব্বু অন্যায়ভাবে অর্থ উপার্জন করেছেন! মিথ্যে কথা সব মিথ্যে…।

আম্মু আমরা বড় হয়েছি, লেখাপড়া শিখেছি, বোঝার মত জ্ঞান আমাদের হয়েছে। সব জানি আম্মু সব জানি এবং বুঝতাম। বুঝেছিলাম বলেই আব্বুর কাজে বাধা দিয়েছি। আব্বু শোননন নি। বলল আম্মু এসব দিয়ে কি হবে? ঐশ্বর্যের ইমারত গড়েছেন তিনি কাদের জন্য? তার এ ধনসম্পদ কাদের জন্য বলো? জবাব দাও আম্মু

সব তোদের জন্য, তোরা সুখে থাকবি এটাই তো তার কামনা ছিলো।

না। আমরা ওসব চাই না। আমরা চাই সৎভাবে বাঁচতে। মানুষের মতো বাঁচতে। জানোয়ারের মতো বাঁচতে আমরা চাই না। আর পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়েছে। কারণ তুমি সব জানো আম্মু…

কিছুক্ষণের মধ্যে পুলিশপ্রধান তার সহকর্মীদের নিয়ে হাজির হলেন। চোখেমুখে তাদের বিস্ময়। কে সেই ন্যায়দন্ড যে বিনা দ্বিধায় অতি সহজে এভাবে খুন করে চলেছে। পুলিশপ্রধান মুখে যতই বলুন অন্তরে অন্তরে ন্যায়দন্ডকে বাহবা না দিয়ে পারলেন না। প্রশাসন বিভাগ যে ব্যক্তিদের সবকিছু জেনেও কিছু বলতে পারতো না, লোক সমাজ যাদের শ্রদ্ধা করতো ভয়ে, যারা সমাজের শিরোমণি সুধীমহল। সত্যকথা বলতে কি, প্রশাসন মহলও এনাদের সমীহ করে চলেন। ন্যায়দন্ড এদের ঠিকই দণ্ড দিয়ে চলেছে কিন্তু মনের কথা ব্যক্ত করার কোনো উপায় ছিলো না, কারণ তিনি একজন আইনজ্ঞ। কে এই হত্যাকারী তার প্রতি যত শ্রদ্ধাশীল হন না কেন, আইনের চোখে সে অপরাধী, কাজেই তাকে খুঁজে বের করার দায়িত্ব তার।

সমস্ত বাড়িতে লোকজন ভীড় জমালো। পুলিশের বাধা এখানে বিফল হলো। বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজন এমনকি মিঃ আসলাম চৌধুরীর পার্টনারগণও উপস্থিত হলেন। সবার চোখেমুখে আতঙ্কের ছাপ। কে এই ন্যায়দন্ড নামধারী যে সবার অলক্ষ্যে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। সহজ গতিতে।

মিঃ আসলাম চৌধুরীর হত্যার পর আতঙ্ক আরও গম্ভীর হলো সবার মনে। বাইরে না বের হলেও ঘরে নিজ শয্যায় নিহত হতে পারেন এটাই ভালভাবে

অনুধাবন করলেন সকলে।

একরকম আহার-নিদ্রা দূর হলো তাদের। অন্যায় ব্যবসায় যারা লিপ্ত ছিলেন তাদের মন ভেঙে গেলো। ব্যবসা-বাণিজ্যের তাদের আর যেন আকাঙ্ক্ষা নেই। এত ধন-সম্পদ ঐশ্বর্য নাইবা থাকলো, এতে মিল কল-কারখানা নাইবা রইলো। তবুও তো শান্তিতে ঘুমাতে পারতেন তারা। আজ যে তাদের ঘুম হারাম হয়ে গেছে। আহারে রুচি নেই, বিলাসে সুখ নেই। অহরহ চিন্তা কোন মুহূর্তে কার সামনে হাজির হবে সেই মৃত্যুদূত ন্যায়দন্ড।

মিঃ আর হামিদ নিহত হবার পর পুলিশমহল অনেক সন্ধান করে ফিরেছেন সেই ড্রাইভারটির কিন্তু কোথাও তাকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। লক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করে তার ছবি ছাপা হয়েছে কিন্তু দাড়িগোঁফে ঢাকা এমন চেহারা কাউকে পাওয়া যায়নি। তবে কি সেই নীলাভ আলোর বলয়ের সঙ্গে এই হত্যালীলার কোন যোগসূত্র আছে। হয়তো থাকতে পারে। অনেকেরই সেই রকম ধারণা হলো। কিন্তু আলোর বলটির কোনো হদিস খুঁজে পাওয়া গেলো না। তবে প্রতি রাতে দেখা যায় বাংলাদেশের আকাশে এই বিস্ময়কর আলোর বলয়।

ত্রাণসামগ্রী নিয়ে প্রতিদিন হাজির হয় ওরা দু'জন বন্যাপীড়িত অসহায় মানুষগুলোর পাশে। বনহুর আর রাণী কোনো দিন স্বেচ্ছাসেবক বেশে, কোনো দিন সেনাবাহিনীর রূপ নিয়ে, কোনো দিন জনসাধারণ নাগরিক সেবা শ্রমের লোক হিসাবে।

অর্থের পরিমাণ বেশি দেওয়ায় বন্যাদুর্গত জনগণের মুখে হাসি ফুটেছে। তারা সেই অর্থে অন্ন-বস্ত্র ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করে আনছে নৌকাযোগে অথবা কলার গাছের ভেলায়। সরকারি সাহায্যও পাচ্ছে, জনগণের দানও আসছে প্রচুর পরিমাণে। আল্লাহ তায়ালার উপরে বিশ্বাস, তারা বাঁচবে। তবে এক শ্রেণীর সেবক বেশী অসৎ ব্যক্তি এসব দ্রব্য থেকে মোটা অংশ সরিয়ে যে নিচ্ছে না তা নয়। তারা নিজেদের আখের গুছিয়ে নিতে ব্যস্ত অনেকেই।

একদিন কিছু মালামাল গোপনে ত্রাণ কেন্দ্র থেকে সরিয়ে ফেলা হচ্ছিলো। গাড়ি বোঝাই করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিলো রাতের অন্ধকারে কোনো এক অসৎ ব্যক্তির গুদামে। সেখান থেকে ভাগাভাগি হয়ে যাবে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী মহলে। গাড়ি চালানো হচ্ছে। ড্রাইভার গাড়ি চালিয়ে চলেছে। কাদামাটির পথ, সাবধানে

গাড়ি চালানো হচ্ছে। এক মাতব্বর বাড়িতে প্রথম রাখা হবে, তারপর যাবে বিভিন্ন মহলে।

হঠাৎ গাড়ি বিগড়ে গেলো, গাড়ি আর চলছে না।

গাড়িতে ছিলো তিনজন জনদরদী নির্বাচিত মহান ব্যক্তি। তারা ক্রুদ্ধ হলেন। একজন বলে উঠলেন–কি হলো ড্রাইভার

স্যার গাড়ি আর চলছে না।

মানে গাড়ি বিগড়ে গেছে।

এসব কি বলছো?

স্যার এসে গেছি।

কোথায় এসে গেছো? এত বন্যাদূর্গত এলাকা, সবে পানি শুকিয়ে গেছে।

ঐ যে কান্নার শব্দ শুনতে পাচ্ছেন?

হাঁ, ওরা বন্যায় মরতে বসেছিলো এখন হয়তো পানি নেমে যাওয়ায় কারও কলেরা হয়ে মারা গেছে। আর সেজন্যই বাচ্চা-কাচ্চা কান্নাকাটি করছে। তাড়াতাড়ি গাড়ি নিয়ে চলো ড্রাইভার।

বললাম তো গাড়ি আর যাবে না।

ড্রাইভার নেকামি ছাড়ো। গাড়ি চালাও…

ড্রাইভার নেমে পড়লো, জমকালো রিভলভার উঁচু করে বললো–ত্রাণ-সামগ্রীগুলো কাঁধে করে নামাও।

একজন অবাক হয়ে ক্রুদ্ধ গলায় বললো—তামাসা করছো ড্রাইভার।

মোটই নয়। আমার হাতের বন্ধুটিকে চিনতে পারছো না? নামাও মাল। যাও এদের ঘরে ঘরে দিয়ে এসো।

ড্রাইভার! তোমাকে পুলিশে দেবো।

সে সুযোগ তোমাদের কারও ভাগ্যে আসবে না। নেমে এসো, মালামালগুলো প্রতিটি বন্যাদুর্গত মানুষ যারা আজ অনাহারে, বিনা চিকিৎসায় মরছে তাদের দিয়ে এসো।

ওরা নামীদামী মানুষ তবুও অগত্যা মালগুলো এবার কাঁধে বয়ে নিয়ে নামিয়ে ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে লাগলো। অসহায় মানুষগুলো ভাবলো এরা বড় দয়ালু রাতের অন্ধকারে আমাদের করুণ অবস্থা স্মরণ করে ত্রাণসামগ্রী বণ্টন করে দিতে এসেছে। কত মহৎ ওরা, কত মহান ওরা।

সব মাল পৌঁছে দিয়ে সরে পড়ছিলো কিন্তু বুঝতে পারলো ড্রাইভার রিভলভার উদ্যত করে অন্ধকারে তাদের লক্ষ করছে। তাই বাধ্য হলো গাড়ির পাশে ফিরে আসতে।

ড্রাইভার বললো–আসনে বসো। এবার তোমাদের পুরস্কার।

মেরো না ড্রাইভার, যা বলেছো তাই করেছি...

ওঠো গাড়িতে।

রিভলভারের মুখে উঠে বসতে বাধ্য হলো মহান ব্যক্তিরা।

ড্রাইভারের শব্দহীন গুলী এক এক করে বিদ্ধ হলো তাদের বুকে।

পরদিন বন্যাদূর্গত এলাকায় একটি মহল্লায় এই খুনের কথা ছড়িয়ে পড়লো। থানা থেকে পুলিশ কর্মকর্তাগণ ছুটে এলেন, তারা দুর্গত এলাকার লোকজনদের ডাকলেন এবং তাদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলেন। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশমহল তেমন কিছু জানতে পারলেন না। তারা শুধু জানালেন যারা নিহত হয়েছেন তারা গভীর রাতে নিজ কাঁধে বহন করে প্রচুর ত্রাণসামগ্রী তাদের ঘরে ঘরে পৌঁছে দিয়েছিলেন। তারা ভক্তি-শ্রদ্ধায় গদগদ হয়ে দুঃখ প্রকাশ করতে লাগলো।

লাশগুলো নিয়ে নানাভাবে তদন্ত চললো। বন্যাদূর্গত এই স্থানটির লোকজনের জিজ্ঞাসাবাদ করে তেমন কোন ক্লু পাওয়া গেলো না। কে-এদের হত্যা করলো,

কেন করলো কেউ জবাব দিতে পারলো না। হঠাৎ পুলিশ কর্মকর্তার দৃষ্টি পড়লো গাড়ির মধ্যে একটি ছোট্ট কাগজ পড়ে আছে। পুলিশ কর্মকর্তা কাগজখানা তুলে নিলেন এবং পড়লেন। তাতে লেখা আছে, ত্রাণসামগ্রী আত্মসাৎ করার চেষ্টার অপরাধে এদের জীবন নেয়া হলো।

—ন্যায়দণ্ড।

অস্ফুট কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন পুলিশ কর্মকর্তা-ন্যায়দন্ডএই স্থানেও পৌঁছে গেছে তাহলে।

প্রতিদিন সবাই প্রতীক্ষা করছে আজকের সংবাদপত্রে নতুন কোন হত্যাকান্ডের সংবাদ আছে কিনা। সপ্তাহ কাটতে না কাটতে এক অফিসের কর্মকর্তা নিহত হলেন তার অফিসকক্ষে।

কর্মকর্তা নিহত হয়েছেন বিস্ময়করভাবে।

তিনি কর্মরত ছিলেন, টেলিফোনে তার বন্ধু আসছেন বলে জানিয়েছেন। কর্মকর্তাটি বিপুল উৎসাহ নিয়ে প্রতীক্ষা করছিলেন এবং কেউ যেন তার আগমনের পর ঐ কক্ষে প্রবেশ না করে এ ব্যাপারেও সকলকে সজাগ করে দিয়েছিলেন। তিনি শুধু বন্ধুই নন, তার একজন হিতাকাক্ষী। বহুদিন পর বাংলাদেশে আসছেন মকদুদ আল কিবরিয়া। তিনি দীর্ঘ সময় আরবদেশে ছিলেন।

গাড়ি এসে থামলো অফিসের সামনে।

ড্রাইভার নেমে গাড়ির পেছন আসনের দরজা খুলে ধরলো।

আল কিবরিয়া ব্রিফকেস হাতে নেমে অফিসের দিকে এগিয়ে চললেন। মাথায় ক্যাপ, চোখে কালো চশমা, মুখে আরাবিয়ান ছাঁটে কাটা দাড়ি গোঁফ। সুন্দর সুঠাম দেহ। আল কিবরিয়া লিফটে উঠে এলেন পাঁচতলায়। বন্ধুর অফিস কক্ষের নম্বর এবং নাম লক্ষ করে প্রবেশ করলেন সেই কক্ষে।

কক্ষের সামনে পাহারাদার বন্দুক হাতে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে। এ সময় এ কক্ষে কারও প্রবেশ নিষেধ। কারণ বন্ধু আল কিবরিয়ার সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ আলাপ আলোচনা আছে।

প্রায় পনেরো মিনিট পর আল কিবরিয়া বেরিয়ে এলেন এবং লিফটে নেমে এলেন। গাড়ির অপেক্ষা করছিলো। কিবরিয়া সাহেব নেমে আসতেই ড্রাইভার গাড়ির দরজা খুলে ধরলো।

আল কিবরিয়া গাড়িতে উঠে বসলেন, তারপর গাড়ি বেরিয়ে গেলো।

বেশ কিছু সময় অতিবাহিত হয়।

কিবরিয়া সাহেব চলে যাবার পর কর্মকর্তার সঙ্গে দেখা করার জন্য অপেক্ষা করছিলেন যারা তারা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। তাদের সাক্ষাৎদানের লিস্ট কর্মকর্তার টেবিলে পূর্বেই দেয়া হয়েছিলো। আল কিবরিয়া চলে যাবার পর তাদের সঙ্গে আলাপ করবেন বলে কর্মকর্তা বলে দিয়েছেন তার প্রাইভেট সেক্রেটারীকে।

প্রাইভেট সেক্রেটারী অপেক্ষা করছিলেন।

সাক্ষাৎকারীদের অনুরোধে এবার প্রাইভেট সেক্রেটারী তার কর্মকর্তার কাছে রিসিভার উঠালেন। কিন্তু কোনো সাড়া পাওয়া গেলো না। পুনরায় চেষ্টা করলেন, তবুও নীরব। কোনো জবাব নেই। বারবার রিসিভার উঠিয়ে যখন কর্মকর্তা সাহেবের সাড়া পেলেন না তখন প্রাইভেট সেক্রেটারী কর্মকর্তার কক্ষে প্রবেশ করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আর্তনাদ করে উঠলেন স্যার খুন হয়েছে...স্যার খুন হয়েছেন...

সাক্ষাৎ দর্শন প্রার্থীগণ শশব্যস্তে ছুটে এলেন সবাই। দারোয়ান ছুটে প্রবেশ করলো। একি ব্যাপার চেয়ারে মাথাটা কাত হয়ে পড়েছে। বুক বেয়ে তাজা রক্ত গড়াচ্ছে, কিছুটা রক্ত পায়ের পাশে গড়িয়ে পড়ছে, সেকি ভয়ংকর দৃশ্য।

মুহূর্তে অফিসের মধ্যে সাড়া পড়ে গেলো, সবাই ভীড় জমালো কর্মকর্তার কক্ষের সামনে। সকলেই ছুটাছুটি করছে, কর্মকর্তার বন্ধুবর আল কিবরিয়া যাবার পর তাকে তার টেবিলের পাশে নিজ আসনে নিহত অবস্থায় দেখা যায়।

পুলিশ কর্মকর্তাগণ এলেন। পুলিশপ্রধানও এলেন, এটা যা-তা ব্যাপার নয়। এটা একটা পুলিশ হেড অফিস। তারই হেড কর্মকর্তা নিহত হয়েছেন।

পুলিশ এসেই ভালভাবে তদন্ত শুরু করলো। পাহারাদার থেকে শুরু করে প্রাইভেট সেক্রেটারী এবং অন্যান্য কর্মচারীকে নানাভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন।

কর্মকর্তাটিকে শব্দবিহীন আগ্নেয় অস্ত্র দ্বারা হত্যা করা হয়েছে। পুলিশ তার টেবিলে পেপার ওয়েট চাপা দেয়া অবস্থায় পেলেন একটি চিঠি–

সম্মানিত মিঃ কাদরী উচ্চপদে অধিষ্ঠিত থেকে অসৎ পথে অর্থ উপার্জন করার কৌশল জানতেন। গোপনে ঘুষ নেওয়া তার পেশা ছিলো। চাকরি প্রদান করার নামে তিনি কামাতেন লক্ষ লক্ষ টাকা। প্রধান কর্মকর্তার অসৎ কর্মকান্ডে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে তার অফিসের নিম্ন কর্মচারিগণ। তাই ঘুষখোরের শাস্তি এমনি ভাবেই হয়। এরপর আসছে চতুর্থ মহান মহৎ ব্যক্তির মুখোসধারীর পালা।

—ন্যায়দণ্ড

চিঠিখানা পড়ে পুলিশ প্রধান বললেন, সেই আরাবিয়ান বন্ধুটিই হলেন ন্যায়দন্ড তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কোথা থেকে এলো কোথায় গেলো তার কোনো হদিস খুঁজে পাওয়া মুশকিল।

পুলিশমহল বহু সন্ধান চালিয়েও কোথাও ন্যায়দন্ডের খোঁজ পেলো না। সারা বাংলাদেশে একটা ভয়ংকর আলোড়ন শুরু হয়েছে। ভয়ভীতি আর আতংক নিয়ে সবাই দিন কাটাচ্ছে। সাবধানের অন্ত নাই, তারই মধ্যে চলেছে হত্যালীলা।

সাধারণ জনসমাজ, তাদের মনে ভয় হলেও আতঙ্ক নেই। তারা জানে, তাদের নিজেদের ওপর আছে অফুরন্ত বিশ্বাস। অসৎ অসাধু উপায়ে তারা পয়সা উপার্জন করে না, যত ভয় তাদের যাদের নিজেদের উপর বিশ্বাস নেই। আছে অফুরন্ত অর্থ, ঐশ্বর্য, ইমারত, ইন্ডাষ্ট্রি গাড়ি-বাড়ি। না জানি চতুর্থ ব্যক্তি কে!

পর পর আরও কয়েকজন ধনকুবেরুর ইহলীলা সাঙ্গ হলো।

কেউ মৃত্যুবরণ করলেন নিজ ইন্ডাষ্ট্রির অফিস কক্ষে। কেই মৃত্যুবরণ করলেন বিমান বন্দরে, কেউ বা বিমানের আসনে। কাউকে প্রাণহীন অবস্থায় পাওয়া গেলো ত্রাণসামগ্রীর গুদামে, আবার কাউকে পাওয়া গেলো বন্যার পানিতে, এরা সবাই মহান ব্যক্তি হিসাবে সমাজে অধিষ্ঠিত।

পুলিশমহল এবং সেনাবাহিনীর জোয়ানগণ কেউ এতটুকু ক্লু খুঁজে বের করতে পারলো না এই ন্যায়দন্ডের। তারপর শুরু হলো অসৎ ব্যবসায়ী চোরাচালানী নিম্নস্তরের ব্যক্তিগণ। হত্যালীলার যেন মহড়া চলেছে যারা অসৎ তারা অন্যায় অনাচার দুর্নীতি ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে। যারা ঘুষখোর ছিলেন বিশেষ করে

চাকরিজীবি মহলে তারাও নাকে-কানে খৎ দিয়ে শপথ করলো আর এ সবে পা বা হাত বাড়াবে না। আল্লাহর নামে শপথ করলো অনেকে এ পথ তারা বর্জন করেছে।

সেদিন হোটেলে বসে বনহুর দৈনিক সংবাদপত্র পাঠ করছিলো।

রাণী দরজা ঠেলে প্রবেশ করতে করতে বললো—-আসতে পারি?

এসো। সংবাদপত্র থেকে দৃষ্টি না তুলেই বললো বনহুর।

রাণী কক্ষে প্রবেশ করে একটা চেয়ারে ধপ্ করে বসে পড়ে বললো, বনহুর তোমার কাজ কি শেষ হলো? এবার ফেরার পালা।

হাঁ, তবে কাজ শেষ হয়নি রাণী। কিছু বাকি আছে, বন্যা পীড়িত জনগণের মধ্যে আমার যা দেয়া প্রয়োজন ছিলো দিয়েছি। তোমার সহযোগিতা ছাড়া এভাবে কাজ সমাধা করতে পারতাম না।

অবশ্য কথাটা সত্য, রাণী ও বনহুর উভয়ে মিলেই বাংলাদেশের এই মহা সমস্যার মোকাবেলা করেছে, তবুও বহু সমস্যা রয়েছে। দেশের জনসাধারণ সবাই যদি সৎ মহৎ হতে তাহলে এ সমস্যার সমাধান মোটেও কঠিন ছিলো না। কিন্তু বনহুর আর রাণী বাংলাদেশের আনাচে কানাচে গভীর অনুসন্ধান চালিয়ে বুঝতে পেরেছে সব জায়গাতেই দুর্নীতি অনাচার অবিচার। ধনকুবের স্বনাম ধন্য ব্যক্তিগণ এসবের পথ প্রদর্শক, তাদের লোভ লালসা অহরহ। শিক্ষা দিচ্ছে মধ্যবিত্ত এবং নিম্ন শ্রেণীর মানুষদের। প্রতিটি অফিসে ঘুষের মহড়া চলেছে, ঘুষ ছাড়া একটি কথাও চলে না। একটি কাজও হয় না, যে কোনো কাজে গেলে প্রথমেই টাকা। সেই টাকার মোহ এক শ্রেণীকে ধনাঢ্য বানাচ্ছে অপর আর এক শ্রেণী হচ্ছে নিঃস্ব অসহায়। এমন একটি দেশ এই বাংলাদেশ যার চারদিকে ছড়িয়ে আছে নদী-নালা, শস্য-শ্যামল মাটির বুক। সেখানে অনায়াসে সুখে স্বাচ্ছন্দে মানুষ দিন যাপন করতে পারে, স্বর্গের শান্তিসুখ লাভ করতে পারে কিন্তু এ দেশেই জন্মে এদেশেরই মানুষ আজ নরাধম, নরশয়তান বনে গেছে। দুর্নীতি আর অন্যায় হয়েছে এদের পেশা।

বনহুর বললো—এদের এ নেশা ছাড়াতে না পারলে বাংলাদেশ তলিয়ে যাবে অতল গহ্বরে।

এরি মধ্যে তুমি তো নিজের নেশায় মেতে উঠেছে।

হা কিছুটা কৃতকার্য হয়েছি রাণী, তবে সে তোমার সহায়তায়। কখনও পুরুষের বেশে, কখনও ড্রাইভার বেশে নানা ভাবে তুমি আমাকে সাহায্য করেছে। নইলে এত অল্প সময়ে পারতাম না...

তাতে কি হয়েছে, এসবে আমার অভিজ্ঞতা আছে। একটু থেমে বললো রাণী– আমার ডাক এসেছে বনহুর, যেতে হবে। আহাদ চৌধুরী নাগাদ্বীপে যাবে। গভীর একটা রহস্য উদ্ঘাটন ব্যাপারে নাগা সরকার তাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। আমাকেও যেতে হবে তার সঙ্গে...

বনহুর সংবাদপত্রটার দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে মৃদু হেসে বললো—স্বামীর আহ্বান অগ্রাহ্য করা যায় না রাণী। অবশ্যই...কতদিন তার সঙ্গে দেখা হয়নি, কাজেই...

ও কিছু না। বনহুর, দীর্ঘ সময় আমরা বাংলাদেশে কাটিয়ে গেলাম। সত্যি দেশটার ওপর আমার মায়া বসে গেছে। শুনেছিলাম সোনার বাংলার সোনার মানুষ...

এ কথা মিথ্যা নয় রাণী। বাংলাদেশের সব মানুষ তো অমানুষ নয়। মানুষও আছে। যারা মানুষ আছে তারা অতি সরল-সহজ এবং তারাই এক শ্রেণীর মানুষনামী জানোয়ারগুলোর কাছে হচ্ছে নিষ্পেষিত, লাঞ্ছিত, বঞ্চিত! এই সব মানুষ আজ দিশেহারা অসহায়।

অফিসে বসে কাজ করছিলেন পুলিশ প্রধান মিঃ মর্তুজা আহমেদ তার অভিজ্ঞতা দীর্ঘ সময়ের। তিনি এই দীর্ঘ সময়ের কর্ম জীবনে এমন ধরনের হত্যাকান্ড দেখেননি। পুলিশমহল দোষীকে গ্রেপ্তার করে আইনের মাধ্যমে বিচার হয়, এমন কি মৃত্যুদন্ডও হয়। দোষী যারা অপরাধী যারা তারা যদি নামী-দামী স্বনামধন্য ব্যক্তি হয় তাহলে তাদের অপরাধ জেনেও তেমন কিছু করা হয় না বা যায় না। এমন কি এসব ক্ষেত্রে আইনও শিথিল হয়ে পড়ে অর্থের বিনিময়ে। পুলিশমহল, প্রশাসন বিভাগ তাদেরও মুখ বন্ধ হয়ে যায় অনেক সময় কারণ বিশেষে। ইচ্ছা থাকলেও এদের সাজা দেয়া সম্ভবপর হয় না। ভাবছেন পুলিশ প্রধান এসব নিয়েই, ওপর ওয়ালাদের চাপে এবং নিজ কর্তব্যের তাগিদে পুলিশ প্রধান এই হত্যালীলার নায়ক ন্যায়দন্ড নামধারীকে খুঁজে ফিরছেন কিন্তু তিনিও এ হত্যালীলাকে সমর্থন করেন অন্তরে অন্তরে। কারণ তিনি ন্যায়, নিষ্ঠাবান সৎ

ব্যক্তি, দীর্ঘ সময় পুলিশে চাকরি করে তিনি সুনাম অর্জন করেন। দুর্নীতিবাজ লোককে তিনি শুধু ঘৃণাই করতেন না, তিনি তাদের পতন কামনা করতেন।

ন্যায়দণ্ড নামধারী যেই হোক তার কাজ অন্যায়ের বিরুদ্ধে। অপরাধীদের চরম শাস্তি যা আইন দিতে সমর্থ হয়নি নানা কারণে। তাদের শাস্তি দিতে সমর্থ হয়েছে সে…হাসেন পুলিশপ্রধান আপন মনে।

এমন সময় এক ভদ্রলোক প্রবেশ করলো তার অফিসকক্ষে।

কক্ষে কেউ ছিলো না। শুধু পুলিশ প্রধান মিঃ মর্তুজা আহমেদ কাজ করছিলেন। পদশব্দে তিনি চোখ তুলে তাকালেন।

পৌরুষদীপ্ত একটি ভদ্রলোক কক্ষে প্রবেশ করে এগিয়ে এলো তার টেবিলের পাশে।

অবাক হয়ে তাকালেন মিঃ মর্তুজা, কে এই ব্যক্তি। প্রথম দৃষ্টিতেই তিনি আকৃষ্ট হলেন। সুন্দর সুঠাম চেহারা, বুদ্ধিদীপ্ত দুটো চোখ। হাত বাড়িয়ে দিলো সে হ্যান্ডশেক করার জন্য।

মিঃ মর্তুজা আহমেদ বিস্ময় নিয়ে হাত বাড়িয়ে দিলেন।

ভদ্রলোক হ্যান্ডশেক করার সময় হেসে বললো—যাকে আপনারা অহরহ খুঁজে ফিরছেন আমি সেই ন্যায়দন্ড!

অস্ফুট কণ্ঠে বললেন পুলিশ প্রধান মিঃ মর্তুজা আহমেদ—-আপনি…আপনিই সেই ন্যায়দন্ড…

হাঁ, মিঃ আহমেদ। আপনার ন্যায়নিষ্ঠা, সতোর কথা আমি শুনেছি। তাই এলাম দেখা করতে। আপনাকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি তবে আপনাকে কঠিন-কঠোর হতে হবে। সততাই আপনার মনোবল, সততাই আপনাকে পথের নির্দেশ দেবে। আচ্ছা চলি মিঃ আহমেদ।

যেভাবে প্রবেশ করছিলো তেমনিভাবে বেরিয়ে গেলো ভদ্রলোকটি।

মিঃ আহমেদের দু'চোখে বিস্ময়, তিনি নিস্পলক দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছেন ওর চলে যাওয়া পথের দিকে।

[পরবর্তী বই হীরা ঝিলের গহ্বরে]

পূর্ববর্তী:

« ৮.১৪ ঈগলের গহ্বরে বনহুর

পরবর্তী:

৮.১৬ হীরা ঝিলের গহ্বরে »